জীবনের চলস্রোত

উপন্যাস

শ্রীমতিলাল দাশ

দুই ট[illegible]

শিব-সাহিত্য কুটীর
২৬-৮ এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রকাশক,
শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।
শিব-সাহিত্য কুটীর
২৬-৮ এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।
১৩৪৬

প্রিণ্টার,
শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল।
আলেকজান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

পরিচয়।

১৩৩৭ সালে রচিত,

এবং ১৩৪৩ সালে

প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত।

১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট.

২। ডি, এম্, লাইব্রেরী

৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

এবং

অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ।

১। **মনীষা**—উপন্যাস—

অন্ধনারীর প্রেমের চিত্র—এক টাকা।

২। **মহানিষ্ক্রমণ**—বুদ্ধের মহৎ বাণী—নাটক, এক টাকা।

৩। **চিরন্তনী**—নাটিকা, আট আনা।

৪। **চার্ব্বাক**—নাটক, আট আনা।

অপূর্ব্ব, অনবদ্য ও অতুলনীয়।

৫। **একলব্য**—নাটক, আট আনা।

স্ত্রী-চরিত্রহীন কিশোরদের অভিনয়োপযোগী

সুন্দর গ্রন্থ।

৬। **দীপশিখা**—কবিতাগুচ্ছ, আট আনা।

৭। **বিরহশতক**—Terza rima ছন্দে রচিত,

বিরহের নব মেঘদূত। আট আনা।

৮। **Bankimchandra**—His life and art, Rs. 2/8

A comprehensive biography and a

thoughtful study.

৯। **বিদ্যুৎ-শিখা**—গল্পগুচ্ছ, এক টাকা।

শ্রীমান্ মনোরঞ্জন দাশকে

স্নেহোপহার।

শুক্লা-ত্রয়োদশী
৮ই আশ্বিন,
১৩৪৬

জীবনের চলস্রোত

১

বালিগঞ্জের এক জন-বিরল পথের ঝাউ-বীথী যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে একটী নয়ন-রঞ্জন বাড়ী পথ-চলা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ অট্টালিকা কেবল শীতাতপের হাত হইতে রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু কথিত গৃহটি গৃহস্বামীর কলাপ্রীতির পরিচয় দিতেছে। মোগল স্থাপত্যের সহিত গ্রীকস্থাপত্য মিশাইয়া এই অপূর্ব্ব নিকেতন নির্ম্মিত হইয়াছিল। সিংহদ্বারের গায়ে পিত্তলফলকে সোণার জলে "চেরী-ভিলা" নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। সেই দরজার উপরে মালতী-লতা পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া চিত্তানন্দকর সুরভি ছড়াইতেছিল।

সিংহদ্বার হইতে রাস্তা দু'মুখী হইয়া অগ্রপ্রক্ষেপ বারান্দার নিম্নে মিশিয়াছে। মাঝে সুগোল পুষ্পক্ষেত্র নানা-দিক্‌দেশজ পুষ্পলতায় সমাবৃত। বেলাশেষের সূর্য্য তাহার সোনালি কিরণ-জাল ফেলিয়া সমস্ত স্থানটিকে স্বর্গীয় সুষমায় ভরিয়া ফেলিয়াছিল। সুসজ্জিতা একটী তরুণী হেমন্তের সেই শান্ত সন্ধ্যায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মুখের লাবণ্য অনুপম, তাহার উপর অস্তাচল-পথবর্ত্তী সূর্য্যের বিদায়-আলিঙ্গনে তাহা আরও কমনীয় দেখাইতেছিল।

একটী যুবক আসিয়া বলিল "আর দেরী ক'রে কি হবে ইন্দিরা, চল আমরা বরং একটী ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

যুবকের বাব্‌রী চুল কাণ বাহিয়া কপোলে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সোণার তার-জড়ানো চশমা। নব্য, সুদর্শন চেহারা। অথচ যুবকের বয়স নিতান্ত কম নয়। অনুমানে ত্রিশের উপর বলিয়া মনে হয়। যৌবনের কমকান্তি বিদায় লইতে চাহে, কিন্তু তাহাকে রাখিবার জন্য চেষ্টা রহিয়াছে।

ইন্দিরা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বাবা না এলে ত যেতে পারব না যোগেশ দা!"

পিতার প্রতি এই ভক্তি যুবকের ভাল লাগিল না। কিন্তু দ্বিরুক্তি করিয়া তরুণীর বিরাগভাজন হইবার সাহসও তাহার নাই, কাজেই যোগেশ চুপ করিয়া রহিল।

হেমন্ত গোধূলি হেমন্তের সন্ধ্যায় ডুবিয়া গেল। প্রতীক্ষমানা তরুণীও ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। সঙ্গীর প্রতি চাহিয়া বলিল "বাবা, আজ কেন এত দেরী করছেন?"

অভিমান দমন করিয়া যুবক উত্তর দিল "কেমন ক'রে বলব ইন্দিরা!"

তাহার কথার মধ্যে একটী নূতন প্রেরণার সাড়া মিলে। ইন্দিরার মর্ম্মস্থল কাঁপিয়া ওঠে। কি যেন সে অনুভব করিতে যায়, পারে না। এমন সময়ে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। গৃহস্বামী মিঃ গুপ্ত আসিয়া নামিলেন। কন্যা দৌড়াইয়া পিতার নিকটে গেল। মিঃ গুপ্ত অপরাধীর মত বলিলেন "মা! আজ বড় দেরী হয়ে গেছে, না?"

ঠোঁট ফুলাইয়া কন্যা উত্তর দিল, "যাও, আর যদি তোমার জন্যে ব'সে থাকি, সেই কোন্ চারটা থেকে সেজেগুজে বসে আছি।"

কন্যার এ অনুযোগ নূতন নয়। বহুবার ভয় প্রদর্শন হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছুই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য মিঃ গুপ্ত বলিলেন, "আজ একখানি পুঁথি পেয়েছি মা, বৌদ্ধযুগের রসশাস্ত্রের পুঁথি, এ থেকে বুঝা যাবে, ভারতবর্ষ মনস্তত্ত্বের আলোচনায় কতদূর অগ্রসর হয়েছে।"

"পুঁথি পেলে তোমার ত কোন জ্ঞান থাকে না বাবা! পুঁথির মধ্যে তুমি কি যে আনন্দ পাও?"

"সে কথা সত্যি, ইন্দিরা! পুঁথির কালো আঁখরগুলি আমার কাছে অমৃত এনে দেয়।"

কথা কহিতে কহিতে পিতা ও পুত্রী বারান্দায় পৌঁছিলেন। যোগেশ নমস্কার করিল। মিঃ গুপ্ত প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "কি হে যোগেশ! ভাল আছ? তারপর কি মনে ক'রে!"

"আজ এসেছিলাম, ইন্দিরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে যাবেন বলেছিলেন, তাই..."

"তা' বেশ! কিন্তু আজ আমি বড় ক্লান্ত, আজ ত আমি যেতে পারব না।"

ইন্দিরা বলিল, "তা'হলে থাক্ বাবা, আর একদিন যাওয়া যাবে।"

যোগেশ ক্ষুণ্ণমনে উত্তর করিল, "কিন্তু আজ পুর্ণিমার রাত ছিল, আজ রাসপূর্ণিমার অঝোর-আলোয় এই স্মৃতিসৌধকে খুবই ভাল দেখাবে।"

মিঃ গুপ্ত আজ পরম প্রসন্ন ছিলেন। তাই বলিলেন, "তা'হলে তুমি আর যোগেশ যাও, কি বল মা!"

ইন্দিরার মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। রূপদক্ষ যোগেশের সঙ্গে দেখার লোভ, আবার নিঃসম্পর্কীয় যুবকের সহিত একক ভ্রমণ। সংসারে লোভেরই জয়, সুতরাং কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তুমি যদি যেতে বল ত যাব বাবা!"

সংসারে মানুষ অপরের ঘাড়ে সংশয়ের বোঝা চাপাইয়া আপন দায়িত্ব বোধ হইতে নিষ্কৃতি চায়।

"তা যাও না, যোগেশ ত আমাদের পর নয়। তা'হলে এখনই বেরিয়ে পড়।"

"না বাবা, তুমি বিশ্রাম করো, তোমাকে খাইয়ে যাব'খন।"

"একদিন না হয় ছোট ছেলেটার তদারক নাই কর্‌লি, যা পাগ্‌লী, শেষে আবার অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

অগত্যা ইন্দিরা যোগেশের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। গড়ের মাঠে পড়িতেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারার দেখা মিলিল। সে যেন এক রূপ-সমুদ্র—তাহাতে পলকে পলকে জ্যোৎস্নার সাদা ঢেউ খেলিয়া যায়। যোগেশ বলিল, "দেখ্‌ছ ইন্দিরা, প্রকৃতির অযত্নন্যস্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে মানুষ ভুল্‌তে পারে না। মানুষ সৌন্দর্য্য-পূজারী, সে আপন হাতেই সুন্দরের বেদী গ'ড়ে তোলে।"

ইন্দিরা বলিল, "তা' ঠিক, মানুষের এইখানেই জয়, মানুষ জীবনের ছোটখাট বিষয় নিয়ে ভুলে থাক্‌তে পারে না, মানুষের অন্তরে যে দেবতা তার বীণা বাজান…"

যোগেশ বাধা দিয়া বলিল, "না, তোমার দেবতা রাখ, এই সভ্যতার যুগে অন্ধ কুসংস্কার নিয়ে থাক্‌লে চলে না, তোমার দেবতা ত মানুষের মনগড়া ভূত। ঋগ্বেদের যুগের মানুষ ভাবত আগুন একজন দেবতা, বাতাস একজন দেবতা, এত লেখাপড়া শিখেও কি তুমি তাদের এখনও দেবতা ব'ল্‌বে ? ওসব কিছু নয়, জগতে মানুষই সবচেয়ে বড়। মানুষই দেবতা ও ভগবান সৃষ্টি করেছে—সেটা তাদের মনের খেয়াল ও স্বপ্ন বই ত নয়। যুগে যুগে তাই মানুষের দেবতার রূপবদল হচ্ছে।"

"না যোগেশ দা, মানুষের মনের মধ্যে যে অসীমের অনুভূতি আছে, যা' তার শিল্পে, কলায়, সাহিত্যে রূপ নিয়েছে, তাকে কি তুমি অস্বীকার ক'র্‌বে ?"

যোগেশ সজোরে উত্তর দিল "না, মোটেই করি না। কিন্তু সেটা মানুষেরই কৃতিত্ব, মানুষেরই মহত্ত্ব—ভগবান আছেন, একথা তাতে প্রমাণ হয় না।"

ইন্দিরা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার চিরপরিচিত মনের বিশ্বাস বাধা পাইতেছে। সে কি বলিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ যোগেশের যুক্তি ও তর্ক তাহার অন্তরকে যেন স্পর্শ করে না।

ইন্দিরা আপন চমক ভুলিয়া বলিল, "যুগে যুগে কালে কালে মানুষ যে সব ধর্ম্মবিশ্বাস গড়ে' তুলেছে, তুমি কি ব'ল্‌তে চাও সব ফাঁকি ?"

"ফাঁকি বই কি, একেবারেই ফাঁকি। মুশা যে কথা বলেছিলেন, ঈশা তা উল্টালেন ; বুদ্ধের যে বাণী, শ্রীকৃষ্ণের সে বাণী নয়, যদি ধর্ম্ম বিজ্ঞানের মত কোনও সত্যবস্তু হ'ত, তা'হলে কি প্রতিদিন এমন করে' মত বদলাত ?"

ইন্দিরা ধীরে বলিল, "তোমার সাথে তর্কে পার্‌ব না, যোগেশ দা! আর তর্ক ক'রে আজ পূর্ণিমার উচ্ছ্বসিত আলোককেও অপমান ক'র্‌তে চাই না।"

যোগেশ ভাবের মোড় ফিরাইয়া বলিল, "সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য; কিন্তু তোমার যখন ভাল লাগ্‌ছে না, তখন এ কথা আজ থাক্‌।"

ইন্দিরা দূর হইতে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নাসাগরে-নিমজ্জিত মেমোরিয়াল দেখিতে লাগিল। প্রকৃতির অজস্র দান সমস্ত প্রান্তরকে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সৌন্দর্য্যের এই প্লাবনের মধ্যে মানুষ যেন আপন দীনতা হারাইয়া ফেলে।

খানিক পরে ইন্দিরা বলিল, "আচ্ছা, যোগেশ দা! তুমি ত তাজ দেখেছ, তাজ বড়, না এই কীর্ত্তি বড়?"

"তাজ! তাজ অতুলনীয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গড়ে উঠেছে মানুষের দম্ভ আর অহমিকায়, তাজ প্রণয়ের সুরভি-পুষ্পাঞ্জলি। তাজের সুষমা অতীন্দ্রিয়, আর এ যেন কথায় কথায় আপন হীনতাকে প্রকাশ ক'রে তুলেছে। তাজ রূপদক্ষ শিল্পীর হৃদয়ের ব্যক্ত স্বপ্ন, আর মেমোরিয়াল প্রাণহীন, রূপহীন স্তূপমাত্র। না, তাজের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌তে যাওয়াই মূর্খতা।"

যোগেশ চুপ করিল।

ইন্দিরা নিস্তব্ধচিত্তে ক্ষণিক যোগেশের কথা অনুভব করিতে চেষ্টা করিল। পরে বলিল, "চল, যোগেশ দা, এখনই ফির্‌তে হবে, রাত্ত হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে আমার জন্মতিথি উৎসবের কথা আলোচনা ক'র্‌তে হবে।"

যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বিশেষ কিছু আয়োজন আছে কি ?"

ইন্দিরা বলিল, হাঁ, বল্‌ছিলেন, এবারকার জন্মতিথি উৎসব জমকালো ক'রে ক'র্‌তে হবে। তুমি মাঝে একদিন আসবে। বৌদির আঁচল ছেড়ে' দু' একবার এলে কোন ক্ষতি হবে না বোধ হয় !"

তরুণীর এই অদ্ভুত প্রশ্ন যোগেশকে বিমূঢ় করিয়া তুলিল। সে নীরবে যৌবনলাবণ্য-ভূষিতা ইন্দিরার সুগৌর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তরই দিল না। কবিরা শুধু অকথিত ভাষা জানেন, তাহা নহে, যোগেশের সেই পলকহীন চক্ষু যেন বলিতেছিল, "ওগো তরুণি ! তুমি যে তোমার রূপলহরী দিয়ে আমায় একান্ত আপন ক'রে তুলেছ, একথা কি তোমায় বার বার ব'লে দিতে হবে ? তোমার আদেশ যে আমার কাছে অলঙ্ঘ্য আইন, একথা কি তুমি জান না ?"

নিরুত্তর যোগেশের দিকে স্মিত হাসিতে চাহিয়া ইন্দিরা বলিল, "কি, কথা বল্‌ছ না যে ? বৌদির নামেই মজে' গেলে বুঝি ?"

যোগেশ আত্মস্থ হইয়া বলিল, "বিদ্রূপ আর কেন কর্‌ছ, ইন্দিরা ! তুমি ডাকলেই ত চ'লে আসি।"

"ভাল মুস্কিল হ'ল দেখছি, তুমি যে মানুষ খুন ক'র্‌তে পার দেখ্‌ছি ?"

বিমূঢ় যোগেশ ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

ইন্দিরা কৌতুক-দীপ্ত হাস্যে বলিল "রসিকতা যে না বুঝে, তার চেয়ে ভীষণ লোক আর জগতে কে থাকৃতে পারে ? থাক্‌, আর কথা কাটাকাটি নয়, এবার মোটর ছেড়ে দাও।"

মোটর চলিল। পূর্ণিমার আলো পথের আলোকে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তবু যোগেশ ও ইন্দিরার চিত্তে যেন কি এক পুলক জাগিয়া রহে।

চেরী-ভিলায় নামিয়া যোগেশ বলিল "আজ তবে আসি ইন্দিরা, সাম্‌নের বুধবারে আবার আস্‌ব।" ইন্দিরা প্রসন্নচিত্তে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল।

যোগেশের সহিত ইন্দিরার বহুদিনের পরিচয়। পিতা জ্যোতিঃপ্রসাদ এই তরুণ শিল্পীকে ইন্দিরার চিত্রশিক্ষক রাখিয়াছিলেন, সেই হইতে যোগেশের যাতায়াত। জ্যেতিঃপ্রসাদ ভারতীয় কৃষ্টির পূজারী হইলেও, প্রগতিকে অবজ্ঞা করিতেন না। পশ্চিমের নব-নবোন্মেষশালিনী গতিকে এবং আধুনিকতার মন্ত্রকে তিনি ত্যাগ করেন নাই, কাজেই ইন্দিরা ও যোগেশের বন্ধুত্বে তিনি বাধা দেন নাই। কিন্তু পুষ্পবীথীর পাশ দিয়া চলিতে চলিতে ইন্দিরার মনে হইল, যোগেশের স্বরের করুণতা যেন স্বাভাবিক নহে। আজ তাহার আলাপের মাঝে যেন নূতন এক ব্যাকুলতার আভাস মিলিতেছিল। ইন্দিরার মনে তখন অন্য বহুচিন্তা ভিড় করিয়া আসিতেছিল। কাজেই যোগেশের কথার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার অবসর ছিল না, সে দ্রুতপদেই পিতার পাঠকক্ষে চলিল।

২

স্তূপাকার পুস্তক, আলমারী, সেল্‌ফ ও তাকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। এখানে ওখানেও নানা বই বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহস্বামী জ্যোতিঃপ্রসাদ গুপ্ত নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদের বর্ত্তমান ভাব ও ধ্যান-তন্ময়তা দেখিলে কেহ ভাবিতে পারে না যে, যৌবনে তিনি একদিন ধরিত্রীর আকুল আহ্বান

প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করিতেন। খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদকে তিনি তখনকার দিনে জীবনের সর্ব্বোত্তম প্রেয় পদার্থ মনে করিতেন। বর্ত্তমানে তিনি অতীত ভারতের গৌরবের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাই ভারতীয় রীতি-নীতির উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও কন্যা ইন্দিরাকে আধুনিকতার পথিক হইতে বাধা দেন নাই। বাহির হইতে তাহার জীবনের এই দু'মুখী গতিধারার সামঞ্জস্য করা মুস্কিল। পাশ করিয়া বাংলাদেশে কাজ না পাইয়া, তিনি পশ্চিম ভারতে চলিয়া যান এবং সেখানকার এক কলেজে অধ্যাপকতার কাজ করেন। অধ্যাপক হিসাবে মিঃ গুপ্তের যথেষ্ট সুনাম ছিল। যেমন খেলা-ধুলায়, যেমন আলাপ-আপ্যায়নে, তেমনি পঠন-পাঠনায়, তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। অধ্যাপকতা করিবার সময় কোনও দেশীয় রাজ্যে গৃহ-শিক্ষকতা করেন। কিংবদন্তী যে সেই সূত্রে তিনি কোনও কারণে বহু অর্থ পান, তাহাই লইয়া তিনি বাংলাদেশে চলিয়া আসিয়া গবেষণার মধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

অতীত জীবনের কাহিনী মিঃ গুপ্তের নিকট প্রিয় নহে, তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধব এ সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়াও কোনও উত্তর পান নাই। অতীতের তিমির-যবনিকা তিনি যেন খুলিতে চান না।

গৃহে পত্নী হিরণ্ময়ী পূজার্চ্চনায় দিনাতিপাত করেন। পতি ও কন্যার সাহচর্য্য তাহাকে তৃপ্ত করে না। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন তিনি এক ভিন্নরাজ্যে বাস করেন। গৃহকর্ম্ম ও দেবপূজার মধ্যে তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। লোকের নিকট বলেন, তাঁহার রুচি ভিন্ন, তাই এইরূপ পৃথক্ থাকেন।

জীবনের চলস্রোত

কন্যা ইন্দিরা চঞ্চল পদক্ষেপে পিতার পাঠকক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাতে মিঃ গুপ্তের ধ্যানভঙ্গ হইল না।

ইন্দিরা বলিল, "বাবা! আজ কি খুব ব্যস্ত আছেন?"

কন্যার সাড়া পাইয়া মিঃ গুপ্ত পুস্তকের পাতা বন্ধ করিয়া উত্তর দিলেন, "না মা, এস, কিছু ব'ল্‌বার আছে?"

কন্যা স্মিতহাস্যে বলিল "আপনার কিছুই মনে থাকে না বাবা, আজ যে বলেছিলেন, জন্মতিথি উৎসবের সমস্ত ঠিকঠাক্ ক'র্‌বেন্।"

চমকিত মিঃ গুপ্ত প্রতিহাস্যে জবাব দিলেন—"তাইত মা! এখন বুড়ো হ'তে চলেছি, সব কথা কি মনে থাকে! ফাল্গুনের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন ত তোমার জন্মতিথি?"

কন্যা প্রসন্নমুখে বলিল, "হাঁ, বাবা।"

"অনেক দেরী আছে, কিন্তু তবুও এখন থেকে পরামর্শ ক'র্‌তে চাই মা। এবার তুমি প্রাপ্তবয়স্কা হ'তে চলেছ। আমার ইচ্ছা, এবার সমস্ত পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে ডেকে এ উৎসবকে সম্পন্ন ও হৃদ্য ক'রে তুল্‌তে হবে! আমার ছোট বয়সের বন্ধু দেবব্রত সেনের ছেলে সত্যব্রতের সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল, তাকে ব'ল্‌তে হবে। ছেলেটি যেমন সুন্দর, তেমনি অমায়িক। শুন্‌লাম্, লেখাপড়ায় তার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। রায়েদের বাড়ী ত নিমন্ত্রণ হবেই, তবে শুধু রেখা ও সুলেখার নয়, ওদের সকলকেই ব'ল্‌তে হবে। গীষ্পতি সোমের সমস্ত পরিবারই আস্‌বে, তার উপর তোমার বন্ধুবান্ধব আছে।"

"আচ্ছা বাবা! এবার তা'হলে সবাইকে নিমন্ত্রণ ক'রব।"

"হাঁ মা, কারও মনে যেন ক্ষোভ না থাকে। তারপর কি আয়োজন ক'র্‌বে, মনে করেছ ?"

"বাবা! আর বার যে বলেছিলেন, বৈদিক যজ্ঞ ক'রে উৎসবের উদ্বোধন ক'র্‌বেন..."

"হাঁ, ভাল কথা মনে করেছ, সকালে যজ্ঞ হবে, তার জন্য আমি বেদপুরাণ পড়ে' সেকালের একটা আবহাওয়া গ'ড়ে তুল্‌ব। যোগেশকে দেখিয়ে দিলে সে বেদী নির্ম্মাণ ক'র্‌তে পার্‌বে। তারপর ?"

"দু'পুরে টেনিস খেলা হবে। তারপর বেলাবেলি একটু বাইরে যাওয়ার আয়োজন ক'র্‌লে মন্দ হয় না।"

"বেশ, তোমরা সদলবলে শিবপুর বেড়াতে যেতে পার, তারপর সন্ধ্যায় ফিরে এসে গান বাজনা হ'তে পারে।"

"সেই বেশ হবে।"

মিঃ গুপ্ত কন্যার আনন্দতৃপ্ত মুখের দিকে ক্ষণিক চাহিয়া কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "আচ্ছা মা, তোমার মা কিছু বলেছেন কি ? পিতার সঙ্কোচ ও দ্বিধা কন্যাকে পীড়িত করিয়া তোলে। ইন্দিরা কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দেয়।

"মা বল্‌ছিলেন যে তিনি তীর্থে যাবেন", আমি বল্‌ছিলাম "মা তুমি এইবারটা থাক, তা তিনি রাজি হন না, মা যে কি ভাবেন, বুঝি না।"

কন্যার কথার কি উত্তর করিবেন, মিঃ গুপ্ত ভাবিয়া পান না। ক্ষণিক অপ্রসন্নচিত্তে পুস্তকের পাতা নাড়িতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, "তিনি যদি না থাক্‌তে চান, তা'হলে অনুরোধ করে কি লাভ মা ? আমি না হয় একবার বলে' দেখ্‌ব।"

"সবাই যখন আস্‌বে, মা না থাক্‌লে কি ভাল হবে ?"

মিঃ গুপ্ত অপ্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "সে ত বুঝি মা, কিন্তু তোমার মায়ের মনের ধারা বিপরীত, তিনি বর্ত্তমানের আদব-কায়দা মাফিক চ'ল্‌তে জানেন না।"

খানিক উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন, পরে ইন্দিরা বলিল, "বাবা এই সঙ্গে যদি রাত্রে চলচ্চিত্রের আয়োজন করা হয়, মন্দ হবে না।"

"তা মন্দ কি ! তোমরা কি অভিনয় ক'র্‌ছ ?"

"তা এখনও ঠিক হয় নি, শীতাংশুবাবু একখানি নূতন নাটক লিখেছেন, সেইটে করা যাবে।"

পিতা বলিলেন, "শীতাংশু লেখে মন্দ নয়, কিন্তু ওর লেখার মধ্যে বড় বিদেশী ভাব, ভারতীয় নাট্যকলার রীতি ও আদর্শ মেনেও ভাল কাব্য-নাটক রচিত হ'তে পারে।"

কন্যা ইন্দিরা উত্তর দিল, "বাংলা নাটক ত পড়েছেন বাবা, সে কেমন কিম্ভূতকিমাকার এক জীব, না আছে তাতে পাশ্চাত্য কলাবিধি, না আছে সংস্কৃত রীতি। কতকগুলি অসমঞ্জস দৃশ্য সাজিয়ে গান ও নাচ জুড়ে দিলেই যেন নাটক হ'ল, বাংলাদেশের এই ধারণা।"

মিঃ গুপ্ত বলিলেন, "এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই মা, বড় সাহিত্যের পিছনে একটা বড় সাধনা, একটা বড় প্রেরণা থাকা চাই। বাংলাদেশের নাটকের মূলে কোনও জাতীয় অভিব্যক্তি কাজ করে নি। অনুকরণ আর অনুসরণে বড় জিনিষ হ'তে পারে না। যাক্‌, শীতাংশু নিজেদের লোক, ও যাই লেখে তাই আমাদের তারিফ করা উচিত।"

"না বাবা, আপনার আশঙ্কার কারণ নেই, এ নাটকটী সত্যই একটী

অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়েছে—শীতাংশুবাবু বলেছেন যে, আমার জন্মতিথির জন্য তিনি এটি বিশেষ ক'রে লিখেছেন।"

পিতা কথা কহিতে লাগিলে, ইন্দিরা সত্যই কোন সঙ্কোচ বোধ করে না, কাজেই শীতাংশুর এই বিশেষ চেষ্টার কথা বলিতে তাহার লজ্জা বা সরম বোধ হইল না, কিন্তু কন্যার প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত বাক্যের পিছনে কোনও ভাব লুকানো আছে কি না, তাহা লইয়া মিঃ গুপ্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

শীতাংশু উদীয়মান ব্যারিষ্টার, সকলেই তাহাকে ইন্দিরার ভাবী বর বলিয়া জানিত। এক সময়ে মিঃ গুপ্তও এই সম্বন্ধ স্থাপনে বিশেষ উৎসুক ছিলেন, কিন্তু সত্যব্রতের সহিত দেখা হইতে তাহার পুরাতন অভিসন্ধি নূতন রূপ ধরিয়াছে।

কন্যার বন্ধুত্ব কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা জানা তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, অথচ পুরুষের চক্ষে ইহা সহজে ধরা পড়ে না। পত্নী হিরণ্ময়ীর নিকট হইতে এসব বিষয়ে কোনও সাহায্য পাওয়া যাইবে না। কারণ, তাহার শুদ্ধান্তঃপুরে বাহিরের লোকের গতিবিধি ছিল না।

নিরুপায় মিঃ গুপ্ত মন স্থির করিবার জন্য আড়ালের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। তাই খানিক পরে বলিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত থাক্ মা, বেয়ারাকে দিয়ে আমার জন্য এক কাপ কফি পাঠিয়ে দিও ত মা।"

কন্যা উঠিয়া বলিল, "দেই বাবা।"

৩

বাড়ীর ভিতর হিরণ্ময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলে সহসা একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। বর্ত্তমান জীবনের সৌষ্ঠব ও মাধুর্য্য কোথাও এই গৃহকে সজ্জিত করিয়া তুলে নাই। দেওয়ালে তথাকথিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক মনের প্রিয় দেবদেবীর পট বিলম্বিত। আধুনিক ওরিয়েণ্টাল আর্ট, তথাকথিত যে সব মনোমোহন দেবমূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা সেখানে ছিল না। সাধারণ চিত্রকরের সাধারণ তুলির আঁকা ছবি। নীচে পূজাবেদীর পরে শিবমূর্ত্তি, ঝালর দিয়া চতুর্দ্দোলা রচনা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যেই রজতগিরিসন্নিভ দীপ্তোজ্জ্বল শিবমূর্ত্তি। পুষ্পগন্ধ সমস্ত গৃহকে সৌরভিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বহুদিন পরে জ্যোতিঃপ্রসাদ পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পত্নী হিরণ্ময়ী ত্রস্ত বিস্ময়ে মাথায় আঁচল টানিয়া দিলেন। দ্বারে সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রবীণ স্বামী, আর ভিতরে অবিগত-যৌবনা পত্নী—হিরণ্ময়ী নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে লজ্জানত বধূর মত কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন।

প্রেমের কি অপূর্ব্ব চিত্র, কি মধুর দৃশ্য! অবাক্ হইয়া ভাবি, প্রেম সত্যই কি প্রকার? কাব্যে ও গানে হাজার তানে প্রেমের প্রশস্তি পড়ি। তথাপি প্রতিদিনই তার রূপ নূতন হইয়া দেখা দেয়। এ যেন কৃষ্ণচূড়ার রক্তপরাগ-মাখানো ফাল্গুনের বাতাস। প্রতি বৎসর যে নবজীবনের বার্ত্তা বহিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। প্রেমের সেই চির-নূতন স্পর্শ হিরণ্ময়ীর জীবনেও দেখা দিয়াছিল। বুকভরা প্রেম লইয়া তিনি

পতিদেবতার পূজা করিতে আসিয়াছিলেন। সেই অগাধ প্রীতির স্রোত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত কি কারণে পতি ও পত্নীর মধ্যে লবণাক্ত সমুদ্রের বিশাল ব্যবধান!

জ্যোতিঃপ্রসাদ ডাকিলেন,—"হিরণ!"

এ যেন বেলাশেষের অস্তাচলের পথিক সূর্য্যের আদর-উজ্জ্বল লালিম কিরণ! হিরণ্ময়ী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, উত্তর দিলেন না। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিতে লাগিলেন, "দেখ হিরণ, বহুদিন তোমাকে কোন অনুরোধ করি নি, আজ ক'র্‌তে এসেছি, আশা করি সে অনুরোধ রাখ্‌বে। তোমার স্বামীর সম্মান মর্য্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ হয় এ কাজ তুমি কথনই ক'র্‌বে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমার আদর্শ ও কল্পনা তোমার থাক্, তা নিয়ে আজ কলহ করতে চাই না, কিন্তু অনর্থক তুমি তোমার স্বামীর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িও না।"

হিরণ্ময়ীর উত্তর দিতে প্রথমে যেন গলা বাধিয়া গেল, পরে দৃপ্ত সিংহিনীর মত জোরে উত্তর করিলেন, "এ তুমি আমায় ভুল বুঝ্‌ছ। তোমার পথের কাঁটা হতে চাই না, কিন্তু যা আমি মনে-প্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করি না, তা আমি কথনও ক'র্‌তে পার্‌বো না।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ কুণ্ঠিত ব্যথিত দৃষ্টিতে ক্ষণিক পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কিন্তু ইন্দিরার ভবিষ্যৎ চিন্তা কি তোমায় একটুও নরম ক'র্‌বে না। শোন হিরণ, মেয়েটার বিয়ে হতে দাও, তারপর তোমার যা খুসী তাই করো।"

"তা হ'তে পারে না। তোমাদের সাথে আমার মত মিল্‌বে না। তোমার মেয়ের বিয়ে তুমিই দাও, আমি কোন তীর্থে গিয়ে থাক্‌ছি।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ ক্ষোভে উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "দেখ আমি না হয় তোমার কাছে অপরাধী, কিন্তু ইন্দিরার প্রতি কি তোমার একটুও মায়া হয় না? সে ত কোন অপরাধে অপরাধী নয়।"

"আমি কারও অপরাধের বিচার ক'র্‌তে বসি নি। কিন্তু আমি যাকে সত্য ও সুন্দর ব'লে মনে করি না, তা কখনও ক'র্‌তে পার্‌বো না। জীবনে যে ধর্ম্ম আমি জানি, তা থেকে বিচ্যুত হ'তে পারবো না।"

"তোমার ধর্ম্মই বড় হ'ল, তোমার স্বামী কিংবা কন্যা কিছুই নয়!"

হিরণ্ময়ী ক্রোধভরে উত্তর দিলেন, "স্বামীত্বের অহঙ্কার ত ষোলো আনা আছে, কিন্তু মনুর শাসন দিয়ে মনকে তুমি বাঁধতে পারো না। আর মনু যে পতির কথা বলেছেন, তোমার আমার মধ্যে সে মধুর সম্বন্ধ নেই··· ।"

মিঃ গুপ্ত বিস্ময়ে পত্নীর পানে চাহিয়া রহিলেন। কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কাল-বৈশাখীর ঝড় এল—একান্ত অবাঞ্ছিত, একান্ত নিষ্ঠুর। তাঁহার মনের মধ্যে নানা ভাবের তরঙ্গ বহিয়া গেল। পত্নীকে মানুষ আপন সম্পত্তি বলিয়া দেখিয়াছে। আর সব জায়গায় পরাজয় হইলেও মানুষের দুঃখ অসহ নহে, কিন্তু পত্নী যখন শাসনের বাইরে, মানুষ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। ক্রোধে ও অভিমানে জোতিঃপ্রসাদ জ্বলিতে লাগিলেন, তথাপি বহ্নিদাহ বাহিরে ধূমায়িত হয় না। মনের আগুন মনেই চাপিয়া বলেন, "আমি অন্যায় করেছি স্বীকার করি। আমি নেহাৎ পাপী। কিন্তু ইন্দিরা ত স্বর্গের পারিজাতের মত শুভ্র ও নিষ্পাপ। তাকে তুমি দয়া কর। তোমার পূজা, তোমার ধর্ম্ম কি তোমায় দয়া ক'র্‌তে বলে না?"

"এখানে দয়ামায়ার কথা কি ব'লছ? আমড়া গাছে কখনও আম ফলে না। জীবনে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে শুচি ও সবচেয়ে মধুর, তা কখনও মিথ্যা ও গ্লানির 'পরে দাঁড়াতে পারে না। অগ্নি সাক্ষী ক'রে যখন বিয়ে হবে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যা ঘটতে দিতে পারবো না। বিয়ে ত আর খেলার জিনিষ নয়—"

জ্যোতিঃপ্রসাদ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, রূঢ়ভাষে বলিলেন, "বেশ, এই যদি তোমার মনের কথা হয়, তোমার যেখানে খুসী সেখানে যাও, আমার গৃহকে আর বিষজর্জ্জর ক'রে তুলো না।"

হিরণ্ময়ী স্বামীর বিরক্তিকে গ্রাহ্য না করিয়া শান্তস্বরে বলিলেন, "আমার জন্য আমি মোটেই ভাবি নে, এ বিশাল পৃথিবীতে আমার আশ্রয়ের অভাব হবে না। কিন্তু তোমাকে ব'লে যেতে চাই, যার সঙ্গেই তোমার কন্যার বিয়ে দাও তাকে যেন তোমার কন্যার ইতিহাস জানিয়ে দিও। আগুন ছাই চাপা থাকে না, সত্য একদিন না একদিন বের হয়ে প'ড়বে।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ কথা কহিলেন না—বিষাদকাতর মুখে বাহির হইয়া গেলেন, হিরণ্ময়ী নীরবে বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে তাহার চোখে জল গড়াইয়া পড়িল। জীবনে দুঃখ বারে বারে দেখা দেয়, তাকে সহা যায়। ভয়কে জয় করিয়া অভয়কে গ্রহণ করিতে, মানুষ সর্ব্বদা উৎসুক। কিন্তু এখানে অন্তহীন হতাশা, শেষহীন ব্যবধান, স্বামীর জীবনে তিনি শুধু ধূমকেতুর মতই দেখা দিয়াছেন, কতবার ভাবিয়াছেন অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিবেন। পতি পতিই, যত অন্যায়ই তিনি করুন, হিন্দুনারীর এই আদর্শ তিনি মানিবেন—কিন্তু কোন দিনই

সে শুভ সুযোগ আসে নাই, আজিও আসিল না। বুদ্ধি যাহাদের সাথী, বিশ্বাসের সহজ সুর তাহাদিগকে বারে বারে এড়াইয়া চলে।

৪

শীতাংশুর পিতা বিপুল বৈভব পুত্রের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। কাজেই অন্নচিন্তা শীতাংশুর মনকে কাতর করে না। অন্নচিন্তা না থাকিলে মানুষের মনে নানারূপ খেয়াল জাগে। শীতাংশুর সে বিষয়ে কোনও অভাব ছিল না। সমস্ত জীবনটা খেয়ালের পিছনেই চলিয়াছে। পড়াশুনায় বিশেষ মন না থাকিলেও ঝোঁকের মাথায় বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়াছে। ব্যবহারজীবির কাজে পসার জমানো সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনার অবসর নাই। ভোগের বিচিত্র আয়োজনের মাঝেই তাহার দিন কাটিয়া যায়।

শীতাংশুর ওখানে সান্ধ্য-মজলিশ বসে। নানাভাবের, নানামতের লোক সেখানে জুটে। দিল্‌দরিয়া শীতাংশু সকলকেই সমান আদর করে। নিজেকে Sex-psychologist প্রচার করিলেও, কোন মতবাদের মধ্যে নিজেকে বাধা দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, দিনে দিনে নূতন মতের মধ্য দিয়া বাড়িয়া চলাই সে জীবনের মহত্ত্ব বলিয়া মনে করিত।

ভবানীপুরের একটি ফাঁকা রাস্তায় বৃহৎ অট্টালিকা। বর্ত্তমানের রুচি ও সৌষ্ঠবের সহস্র সরঞ্জাম দিয়া শীতাংশুর পিতা রম্য ও শোভন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অট্টালিকার বৃহৎ দর্‌দালান নানাবিধ চিত্র ও সজ্জায় সুশোভিত। সেইখানেই মজলিশ বসে। প্রত্যেকেই খেয়াল

মত যাহা খুসী তাহাই বলে, যাহা খুসী তাহাই করে। কবি যে বলিয়াছেন :—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।"

তাহাই মজলিশের মূল মন্ত্র। অবশ্য শীতাংশু ফ্রয়েড্, জুঙ্গ প্রভৃতির বুক্‌নি দিয়া এই মন্ত্রকে ঘোরাল ও সরস করিত।

সেদিন বৈঠক জমিয়াছিল। "ভারতবাণী"র সম্পাদক সুব্রত প্রাচীন-পন্থী, তর্কে ও খেলায় সে সময়ে ও অসময়ে কেবলি প্রচার করিত যে, ভারতবর্ষের কৃষ্টি জগতে অদ্বিতীয়। বর্ত্তমান সাহিত্যের অশ্লীলতা লইয়া কথা চলিতেছিল।

সুব্রত জোর গলায় কহিতেছিল, "না ভাই, এ কথা আমি ব'ল্‌তে চাইনে যে, সাহিত্যের মধ্যে কেবলি শিবেরই বিজয় কীর্ত্তন ক'র্‌তে হবে। কিন্তু বড় সাহিত্যের পিছনে চাই সুস্থ মন, জীবনের অসুন্দর ও অশুচি দিক, সুস্থ ও সবল রূপদক্ষের তুলির স্পর্শে, সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠে। সাহিত্যের যে ব্যঞ্জনা, তা সব সময়ই মনকে উন্নত ও পবিত্র ক'রে তোলে। যে লেখা মনকে পীড়িত করে, সে লেখা সুস্থতার চিহ্ন নয়…"

শীতাংশু বলিল, "তুমি কি ব'ল্‌তে চাও, বাংলাদেশের বর্ত্তমান সাহিত্য রোগের প্রলাপ?"

"রোগের প্রলাপ বই কি! যা সত্য সৃষ্টি, তা মহত্ত্বের দিকেই বেড়ে চলে। বাংলাদেশের বর্ত্তমান রিরংসার সাহিত্য, সুস্থ প্রাণের ক্রীড়া নহে, রূপদক্ষের সৃষ্টি নহে।"

বিজন সেন উদীয়মান কবি বলিয়া আত্মশ্লাঘা করে। ছন্দের বিপ্লবে,

ভাষার বিপ্লবে তাহার কবিতা এক অদ্ভুত জিনিষ। কিন্তু বাংলাদেশের পাঠক অচেতন, তাই মাসিকের পাতায়, তাহার ভাব-ব্যভিচার অবাধে প্রচার পাইতেছিল।

বাব্‌রী চুলের ফাঁকে ঢাকা চশমা খুলিয়া কোমল মিহিসুরে সে বলিল, "এ আপনি অন্যায় ব'ল্‌ছেন, সুব্রতবাবু। আমরা সুন্দরের পূজারী, শিল্পী রূপকে, অরূপলোকের প্রকাশের মাঝে মূর্ত্ত ক'রে তোলে। আর্ট কখনও জীবনকে তুচ্ছ করে না, তার কাছে সবই শুচি, সুন্দর। আমরা পথিক, আমরা জীবনের সবই অনুভব ক'র্‌তে চাই। আমাদের কাছে কারও কোন অগৌরব নেই।"

সুব্রত চটিয়া উঠিল, বলিল, "আর ন্যাকামী কেন, আর্ট আর্ট ক'রে তোমরা শুধু ভড়ং করেই চলেছ। তোমাদের লালসা তোমাদের লেখায় শতধারে বেয়ে প'ড়ছে। সত্য ও সুন্দরের সাথে তার কোনই যোগ নেই। যার তার আর্টিষ্ট হওয়া সাজে না। তার জন্য চাই সাধনা, চাই তপস্যা, আর্টের আনন্দ কামনায় নয়, কামজয়ে। বীর্য্যবান্ পুরুষ সংগ্রাম জয় ক'রে যে আনন্দ পায়, এ সেই আনন্দ। কুৎসিৎকে জয় করবার আনন্দ। তোমরা মানুষ নও, পিশাচ। তোমাদের দৃষ্টি শকুনের মত, ভাগাড়ের দিকেই চেয়ে আছে।"

সত্যব্রত শীতাংশুর সহপাঠী। সে রসায়নে এম-এ পাশ করিয়া, ভারতীয় ভেষজ হইতে নূতন নূতন ঔষধ করিয়া বাজারে চালাইবার চেষ্টায় আছে। অল্পভাষী সত্যব্রত কথা কম বলে, কিন্তু যাহা বলে তাহা অনেক চিন্তা করিয়াই বলে। সে বিবাদ থামাইবার উদ্দেশ্যেই বলিল, "সুব্রত, ঝগড়া ক'রে সত্য প্রমাণ হয় না। আর্টের উৎস জীবন,

জীবনের শুচি ও অশুচি সবকেই আর্ট গ্রহণ ক'রে আপনার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে অমৃত ক'রে দেয়।"

"আমিও ঠিক ঐ কথা বল্‌ছিলাম। তবে এদের কদর্য্যতাকে গালাগালি না দিয়ে পারা যায় না।"

শীতাংশু কহিল, "আর্ট আর মর‍্যালিটি এক নয়। সমস্ত আর্টই sublimation of the sex-energy।…"

তর্ক হয়ত চলিত, কিন্তু এই সময় বেয়ারা ট্রেতে করিয়া চা লইয়া আসিল। ধূমায়িত পানীয়ের সুরভি তর্কের চেয়ে মধুর মনে করিয়া সকলেই চা পানে মনোনিবেশ করিল। চা পর্ব্ব শেষ হইলে গান চলিল। শীতাংশু গান খুব ভালবাসিত। মাঝে মাঝে গুণী ওস্তাদের সন্ধান করিয়া সান্ধ্য-মজলিশ জমাইত। নীরেশ বাঙ্গালীর ছেলে। অন্নবস্ত্রের সমস্যার দিনে সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, সে শুধু সুরের মায়ায় ভুলিয়া, পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া কালোয়াতী গান শিখিয়া ফিরিয়াছে। লোকে তাহাকে পুছে না, কলাবিদ্‌ শীতাংশু তাহাকে কলিকাতার অভিজাত মহলে পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টায় আছে। তান্‌পুরা টানিয়া লইয়া সে সুরের বোধনোৎসবে ব্যাপৃত হইল। উপস্থিত শ্রোতারা নিজের মনে নানা চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা পাশের সঙ্গীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। বিজন পকেট হইতে ফাউন্টেন পেন বাহির করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ কবিল। সুব্রত মাসিকের পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিক পরে নীরেশ গান আরম্ভ করিল। সাহানা, তেলেনা, মালকোষ, তোড়ী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর আলাপ চলিল।

কি সুন্দর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

গায়ক যখন কাকাতুয়ার মত, শেখাবুলি আওড়ায়, তখন হৃদয় বিহ্বল হইয়া ওঠে না, নীরেশের মুন্সীয়ানার মাঝে, নূতন সৃষ্টির বিরাট্ প্রেরণা ছিল। তাই কালোয়াতী গানও সকলকে মুগ্ধ করিল। গান থামিলে সত্যব্রত প্রশংসার সুরে কহিল, "আজ সত্যকার গানই শুন্লুম্।"

সুব্রত এই সুরে সুর মিলাইয়া কহিল, "হিন্দু-সঙ্গীতই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। কিন্তু দুঃখ এই যে, পিয়ানো ও হারমোনিয়মের টুং টাং দিয়েই আমরা সেই বিরাট অবদানকে ভুল্তে বসেছি।"

নীরেশ বিনয়-নম্রভাবে বলিল, "আমি আমার গানে নানা বিদেশী ভঙ্গী আমদানী করেছি।"

সুব্রত উষ্ণ হইয়া বলিল, "না! নীরেশ বাবু! অমন কাজটীও ক'র্বেন্ না, ভারতীয় সাধনার বিশেষ রূপটীকে ভেজাল দিয়ে বিরূপ ক'র্বেন্ না।"

শীতাংশু বলিল, "ভাই সুব্রত, এটা তোমার গোঁড়ামী, জীবনে বৃহৎ দৃষ্টি চাই। পশ্চিমের সভ্যতা আজ জগজ্জয়ী, তার মূলে তার বিরাট্ দৃষ্টি।"

সত্যব্রত বলিল, "একথা ঠিক। ভারতবর্ষ কখনও এই সংকীর্ণতার আত্মঘাতী মন্ত্রণা গ্রহণ করে নি।"

নীরেশ উৎসাহিত হইয়া উত্তর দিল, "আপনি ঠিক বলেছেন। আমাদের কালোয়াতী গান বাঁধা বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে সবল ক'র্তে হবে, সচল ক'র্তে হবে।"

শীতাংশু বলিল, "এইখানেই আমাদের দেশের লোকের অন্ধতা। বিদেশীকে আত্মসাৎ ক'র্তে পার্লে সে বিদেশীই থাকে না। আপন ধন হয়ে দাঁড়ায়। যাক্, নীরেশের গান তোমাদের ভাল লেগেছে, এতে আমি

খুব খুসী হয়েছি। ইন্দিরা দেবীর জন্মোৎসবে নীরেশ এবার নূতন গান নূতন সুরে গাইবে। আমি যে নাটক লিখ্‌ছি, তার গান সংযোজনাও নীরেশ ক'র্‌বে।"

জন্মোৎসবের কথায় বিজন আপন কৃতিত্ব জানাইবার সুযোগ পাইল, কহিল, "নিমন্ত্রণের চিঠির জন্য কবিতা লিখ্‌বার ভার পেয়েছি আমি। এই চার লাইন লিখেছি, শুন্‌বে ভাই।"

শীতাংশু বলিল, "বেশ পড়।"

বিজন তখন সুর করিয়া পড়িল ঃ—

"জীবন খাতার শূন্য পাতায় যুগান্তরের বাণী,
নূতন ক'রে নেব জানি।
পথের সাথী বন্ধু যারা, লওগো নমস্কার,
নূতন বছর, নূতন পুরস্কার॥"

সুব্রত বলিল, "খাসা হয়েছে। তবে কিছুই বুঝতে পারি না—এই যা দুঃখ।"

জনৈক শ্রোতা বলিল, "উপহাস করেন কেন? শুন্‌তে ত' বেশ হয়েছে। নমস্কারে আর পুরস্কারে বেশ মিলেছে। আর কবির ভাষায় মনের কথাটীও বেশ বলা হয়েছে।"

সুব্রত টিট্‌কারী দিয়া কহিল, "ওর একটা ইংরাজী অনুবাদও সাথে সাথে দিয়ে দাও না ভাই। রবিঠাকুরের লিখনের মত ইংরাজী দিলে মানে বোঝাটা সহজ হবে।"

বিজন বলিল, "যে রসনা কবিগুরুর নিন্দা করে তার তিরস্কার আমার পুরস্কার।"

সত্যব্রত কহিল, "সুব্রত, থাম যথেষ্ট হয়েছে।"

মজলিশ ভাঙিবার পূর্ব্বে শীতাংশু সত্যব্রতকে কহিল, "ভাই এবার আমার নাটক অভিনয়ের সময় তোমায় আস্‌তেই হবে।"

সত্যব্রত বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, ধীরে ধীরে জবাব দিল "বাইরের রস নিয়েই আমার কারবার ভাই! মনের রসের সমজ্‌দার্‌ ত নই।"

৫

রৌদ্রভরা অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণ। বাড়ীর পিছনে পুষ্পকুঞ্জে বসিয়া শীতাংশু নিজের নাটক রচনা করিতেছিল। ভাবী বধূ ইন্দিরা ও বন্ধুদলকে অবাক্‌ করিবার জন্য সে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের বাংলা রূপ দেবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করা কবি-প্রসিদ্ধি। তাহার অন্যতম সুবিধা, লোক তাহাতে হঠাৎ নূতনত্বার চমক ধরিতে পারে না। গতানুগতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কাব্যের পরীক্ষা করে।

শীতাংশু অহল্যার কাহিনী লইয়া আদি রসের অপূর্ব্ব আখ্যান রচনা করিয়াছিল। অহল্যার মুখে বর্ত্তমান নারীর যৌন মনস্তত্ত্বের চমকপ্রদ কথা জুড়িয়া দিয়া সে নাটককে একেবারে অত্যাধুনিক করিয়া তুলিয়াছিল। ভাবমগ্ন শীতাংশুর চোখ কে পিছন হইতে ঢাকিয়া ফেলিল। শীতাংশু অঙ্গুলিস্পর্শে বুঝিল, সে ইন্দিরা। কিন্তু কৌতুক করিবার জন্য বলিল, "কে নীরেশ নাকি, বড় ফাজিল হয়েছিস্‌, ছেড়ে দে!"

ইন্দিরা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে "বলিহারি তোমার অনুমান-শক্তি।" "তুমি এখানে হঠাৎ এসে পড়বে, তা ভাবিনি ?"

"তোমার মা পড়েছেন ঘুমিয়ে—এদিকটায় কাউকে দেখলাম না—যাক্, নাটক শেষ হ'ল ?"

"হয়েছে। একটু আধটু পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে হবে।"

ইন্দিরা বলিল, "ঘসে মেজে যেমন রূপ হয় না, কেটে কুটে তেমন কাব্যি রচনা চলে না। যা সত্য কাব্য, তা সৃষ্টির মত সর্ব্বাঙ্গ ও সুন্দরভাবে দেখা দেয়।"

"আমি সরস্বতীর বরপুত্র নই। আর ইতিহাসও বলে, অনেক বড় বড় কবিও লেখা অনেক সংশোধন করেছেন।"

"কিন্তু তোমার নাটকের মূল কথা কি ?"

"ঠিক দু'চার কথায় বলা চলে না; আমি যা ব'ল্‌তে চেয়েছি, তাকে ইংরাজীতে বলা যেতে পারে, Chastity of passion (আসক্তির নির্ম্মলতা)। মানুষ যে দেবতা নয়। নর-নারীর জীবনে কামনা ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছল হয়ে ওঠে, একথা আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি; আর বলেছি, এই কামনার প্রকাশ সত্য ও সুন্দর। তাকে অসতীত্ব ও অসংযম ব'লে যারা চুণকালি দিয়েছে, তারা মানুষ-চরিত্রকে ঠিক ঠিক দেখে নি।"

"বড় নূতন কথা। এ নাটক কি বাবা ক'র্‌তে দেবেন ? ভাল কথা, বাবা আমার সঙ্গে এসেছেন। তিনি হলঘরে বসে আছেন। চল, আমার সঙ্গে সেখানে যাবে।"

"বিংশ শতাব্দীতে বাস ক'রে এখনও বেড়ার বাঁধন চাই ? আমি

ত বাঘ নই যে, আমার কাছে একা একা আসা চলে না। তোমার বাবাকে আবার কেন কষ্ট ক'রে এনেছ, ইন্দিরা ?"

"বেড়ার জন্য নয়, তাঁর দরকার আছে।"

শীতাংশু বলিল, "চল। এ কথা এতক্ষণ বল নি কেন ?"

হলঘরে মিঃ গুপ্ত বসিয়া একখানি সচিত্র মাসিকের ছবি দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে ইন্দিরা ও শীতাংশু আসিয়া প্রবেশ করিল। মিঃ গুপ্ত শীতাংশুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাক্, বাঁচা গেল, তোমার দেখা না পেলে, মনের অস্বস্তি কিছুতেই যেত না। ইন্দিরার জন্মোৎসবের সমস্ত ভারই তোমাদের উপর।"

শীতাংশু বলিল, "এজন্য আপনার আসার কোনই দরকার ছিল না। আমায় খবর দিলেই আমি হাজির হতুম্।"

"তা' বটে! আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।" শীতাংশু বলিল "চাকরকে কি একটু চা ক'র্‌তে ব'ল্‌ব ?" জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "না, আমায় অনেক জায়গায় ঘুর্‌তে হবে। তবে তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে। তুমি অবসর-মত আমার সাথে একবার দেখা ক'র্‌বে ?"

শীতাংশুর মন আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিয়া লইল, একথা তাহাদের ভাবী পরিণয় সম্বন্ধে। ইন্দিরার প্রতি কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া চুপি চুপি হাসিয়া লইল। পরে জ্যোতিঃপ্রসাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কাল সন্ধ্যেবেলায়ই যাব।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কন্যাকে কহিলেন, "মা তুমি না হয় এখানে ব'সে গল্প কর। ফিরে যাওয়ার সময়ে না হয় তুলে নেব'খন।"

ইন্দিরা বলিল, "আমি তোমার সাথে আসি না কেন ?"

"না, তোমার কষ্ট ক'রে লাভ নেই। আমার অনেক জায়গায় ঘুর্‌তে হবে।"

পিতা চলিয়া গেলে, শীতাংশুকে ইন্দিরা বলিল, "তোমার নাটক অভিনয় ক'র্‌লে সবাই হয় ত ক্ষেপে উঠ্‌বে। ভারতবর্ষের লোকের মনে সতীত্ব ও সংযমের যে মজ্জাগত ধারণা আছে, তোমার লেখা শুনে তা বিচলিত হয়ে উঠ্‌বে।"

শীতাংশু খুসী হইয়া জবাব দিল "উঠ্‌ক্, সেই জন্যেই আমার লেখা। মৃত জীবনের চিতাশয্যা সাজিয়ে আমরা জয়ী হতে পারবো না, ভারতবর্ষকে আজ গতির বাণী শোনাতে হবে। সারা পৃথিবী চ'ল্‌ছে, ভারতবর্ষকে তার তালে তালে চ'ল্‌তে হবে। নর ও নারীর দেহের পবিত্রতা একটা সংস্কার বই ত নয়। ওটা আসলে একটা মিথ্যা বুজ্‌রুকী। আমরা ত পলে পলে মানস-ব্যভিচার কর্‌ছি, কাজেই দৈহিক ব্যভিচার হ'লেই আর কি এমন অন্যায় হবে ? মানুষের মনে যে বাসনা আছে, তা প্রকৃতির আপন হাতে দেওয়া অস্ত্র। সৃষ্টিরক্ষার কবচ সে। তাকে বরণ করে' মহত্ত্ব নেই, আট্‌কে রেখেও পুরুষত্ব নেই। প্রাকৃতিক বলের মত সে আপন জোরেই তার কাজ করে'ই চলেছে।"

"তোমার কথা আমি ঠিক ধর্‌তে পাচ্ছি না।"

"তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। নূতন মত সহজে মনে ঢোকে না। আমি বল্‌ছি, অহল্যা যে ইন্দ্রকে গ্রহণ করেছিল, সে স্বামী জেনে। তাতে ওর দৈহিক বা মানসিক কোনই অপবিত্রতা হয় নি। ফুলের মত শুচি অহল্যাকে অভিশাপের পাষাণে পাষাণী ক'রে রাখা সেকালের

নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। পুরুষের সহিত একবার মিলন হ'লেই যে নারীর সমস্ত জীবন কলঙ্কিত হবে, একথা বলা একান্ত স্বার্থপরতা।"

"তুমি যে অবাক্ ক'রে তুল্ছ। সমস্ত দেশে, সমস্ত মানুষ নরনারীর যে পবিত্র সম্বন্ধকে শুচি ও সুন্দর ক'রে তুল্‌বার আয়োজন করেছে, তার মূল তুমি ভাঙ্‌তে বসেছ···।"

বাধা দিয়া শীতাংশু বলিল, "সে ভুল বই কিছু নয়। নর ও নারী তাকে মেনে নিয়েছে ভয়ে, সত্যের খাতিরে নয়। আসলে নর ও নারী বহুগামী হ'তে চায়, তাদের বেঁধে রাখ্‌তে যাওয়া বাতুলতা।"

শীতাংশুর কথা ইন্দিরার মনে বিপ্লব জাগাইয়া তুলিল। তাহার অন্তরের যে নারীপ্রকৃতি ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিতেছে, তাহার মধ্যে যে বেদনা ও ক্ষুধা ছিল, শীতাংশুর কথায় তাহারা ক্ষুধাতুরা ব্যাঘ্রীর মত আস্ফালন করিতেছিল। নবীন যৌবন আপন প্রবৃত্তির পরিণতির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। তথাপি চিরপরিচিত মনোভাব অগ্নিশিখাকে নিভাইয়া দেয়। সে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, অভিভূত ব্যক্তির মত, "না, তোমার কথা কথনই সত্য নয়। মানুষের সাথে তা'হলে পশুর প্রভেদ থাক্‌ত না। মানুষ যে বড়, তা বাসনাকে জয় ক'রে, বাসনাকে বড় ক'রে নয়।"

শীতাংশু ইন্দিরার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা বুঝিতে পারিয়া বলিল "যাক্, এ তর্কে আজ লাভ নেই, একদিনে তুমি বুঝ্‌বে না, বুঝালেও মান্‌বে না—বেয়ারাকে একটু চা দিতে বলি।"

চা আসিল। ইন্দিরা নীরবে চা পান করিতে করিতে শীতাংশুর কথা ভাবিতেছিল। সুরার মত এই নূতন কথার মাদকতা তাহার মনকে যেন

মত্ত করিতে চাহে। কিন্তু কিছুতেই সে এই মতবাদকে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না।

চা-পান শেষ হইলে, সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি যে এই মতবাদ প্রচার ক'র্‌ছ, এ তোমার সত্য প্রাণের কথা, না বিলিতী মতের অনুকরণ?"

এ কথার উত্তর দেওয়া শীতাংশুর পক্ষে অসম্ভব হইত, অথবা অসুবিধা-জনক হইত, কিন্তু জ্যোতিঃপ্রসাদের পুনরাগমন তাহাকে রক্ষা করিল।

সে নির্ভয়ে বলিল, "আজ্‌ এ প্রশ্ন থাক্‌। মানুষের মনে সংস্কার, শাস্ত্র, আপ্তবাক্য জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসেছে। তাই সে সত্যকে মুক্ত করে', নগ্ন করে' দেখ্‌তে পায় না। বাইরের সমস্ত বাধা ঠেলে তুমি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর, তা'হলে বুঝ্‌বে।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি তর্ক হচ্ছে?"

শীতাংশু অম্লান বদনে উত্তর করিল "ফ্রয়েডের কথা হচ্ছিল।"

ইন্দিরা শীতাংশুর সসঙ্কোচ উত্তরে বিরক্ত হইল। তাহার মনে হইল, শীতাংশুর সত্য মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে না; যে সত্য লজ্জা ও আড়ালকে আশ্রয় করে, তাহাকে বড় বলিয়া মনে করিতে ইন্দিরার প্রবৃত্তি হইল না।

জ্যোতিঃপ্রসাদ কন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। ইন্দিরা কিন্তু মন হইতে শীতাংশুর কথা তাড়াইতে পারিল না; যৌন কথার আকর্ষণ, যৌন বিষয়ক কৌতূহল নীতিতে থামে না, নালি-ঘায়ের মত সে কেবল বাড়িয়াই চলে। বয়ঃসন্ধির যুগে যখন এই আদিম প্রবৃত্তি উগ্র ও আকুল হইয়া দেখা দেয়, সেই বয়সে শীতাংশু কর্তৃক প্রজ্জলিত বিষদাহ ইন্দিরার মনকে সময়ে অসময়ে চঞ্চল ও ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল।

৬

যোগেশ ইন্দিরার জন্মোৎসবে উপহার দিবার জন্য একটী ছবি আঁকিতেছিল। যোগেশ বিবাহিত; কিন্তু ঘরের প্রেমকেই সে সারাৎসার মনে করে না। যোগেশ বলে, "শিল্পীর মন সীমা-বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে চায় না। যেখানেই সুন্দর, সেখানেই সুষমা, সেইখানেই সে পূজার অর্ঘ্য প্রদান করে। এই মতবাদের আশ্রয়েই সে অতুলনীয়া রূপসী ইন্দিরার প্রতি তাহার আকর্ষণকে সমর্থন করে। বাসনার বিষ-বীজ কখন যে এই পূজাকে লালসায় পরিণত করিতে বসিয়াছে, তাহা যোগেশ বুঝিতে পারে নাই। প্রথম প্রণয়ীর আগ্রহ ও উন্মাদনা লইয়া তাই সে ছবি আঁকিতে বসিয়াছে।

বনস্পতির শ্যামল ছায়ায় বৃহৎকলেবর নদী বহিয়া চলিয়াছে। তাহাতে মৎস্যকন্যারা ডুবিয়া মরিতেছে। পটে এই ছবি তুলিবার আগ্রহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। যোগেশ নিজেকে ওরিয়েণ্টাল আর্টিষ্ট বলিয়া প্রচার করে। ওরিয়েণ্টাল আর্ট সম্বন্ধে একদিন বন্ধুর সহিত কথা হইতেছিল। যোগেশ বলে, "আমরা রূপের চেয়ে ভঙ্গীকে বড় ক'রে দেখি। প্রকাশকে আমরা সবার উপরে আসন দেই। আমাদের কাছে ভাবই পরম কাম্য।" বন্ধু বলিয়াছিল, "কিন্তু তোমরা যা আঁক তা আমরা বুঝতে পারি না কেন? সমস্ত বড় শিল্প বিশ্বজনের চিত্তের উপর আনন্দ-প্রলেপ দেয়, কিন্তু তোমাদের আঁকা ছবি যে আমরা বুঝি না।"

"না, ঐখানেই তোমাদের ভুল। শিল্প-বস্তুকে অনুভব ক'রতে হ'লে প্রাণ চাই, সে প্রাণ সকলের নেই। শিল্পী বড় মরমী। তার বিশেষ

দৃষ্টি যারা পায় নি, শিল্পকে তারা কেমন ক'রে বুঝ্বে! আমরা জীবনের বিশেষ মুহূর্ত্তের বিশেষ একটী ছন্দকে রূপ দেই। চঞ্চল গতিবেগকে মূর্ত্ত ক'রে তুলি, সে দরদ দিয়ে বুঝ্তে হবে। বিনা সাধনায় কেমন ক'রে তার রস বুঝ্বে?"

বন্ধু উত্তর দিয়াছিল, "জগজ্জয়ী যাদের নাম, তাদের ছবি ত আমরা বুঝি। পথচলা পথিকও র‍্যাফেল, মাইকেল-এঞ্জেলোর ছবির মাহাত্ম্য বোঝে।"

যোগেশ তর্ক করে। "এখানে এক উত্তর, তারা বোঝে না, অরসিকের নিকট রস নিবেদন চলে না। যারা রসিক নয়, তারা আমাদের মত রূপদক্ষের কাব্য বুঝবে না।"

বন্ধু বলে, "ভাই, নামজাদা শিল্পরসিকেরা বলেন, কাব্যের চেয়ে চিত্র বড়। কারণ কাব্য সবার জন্য নয়, চিত্র সবার জন্য। তুমি তা'হলে একথা কি বদলে' দিতে চাও?"

যোগেশ গায়ের জোরে মীমাংসা করে, "তা বৈ কি! কবিরা নিরঙ্কুশ। আমরা নূতনকে সৃষ্টি করে' চলেছি। তোমরা যদি তার রস অনুভব না কর, ভাবীকালের মানুষ ক'রবে।" একথার উত্তর চলে না। বন্ধু নীরব হইয়া থাকে।

ইন্দিরার জন্মোৎসবের জন্য কল্পিত ছবিটিকে, সে আপন শিল্পজীবনের চরম দান করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। কল্পনাটি যে কেন তাহার মাথায় আসিয়াছিল, তাহা সে জানে না। তবে একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে মিঃ গুপ্ত কন্যাকে মৎস্যকন্যার পুরাণ-বার্ত্তা বলিতে-ছিলেন। যোগেশ সঙ্গে ছিল। সে দিনের সে কথা হয় ত তাহার মনে আপন ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল।

জীবনের চলস্রোত

যোগেশের কলাভবন অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। দেওয়ালে বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত বিবিধ চিত্র রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মাটির টবে ফুলের চারা পুষ্পভারে নত হইয়া রহিয়াছে। যোগেশ অন্যমনে কাজ করিতেছিল। পত্নী নীরদা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি ক'র্‌ছ ?"

ভাবুকতা মানুষের জীবনে কখনও কখনও বিষের কাজ করে। আশাতীতের পানে যাহাদের লুব্ধ দৃষ্টি, তাহারা সংসারে যাহা পায়, তাহাতে কখনও তৃপ্ত থাকে না। চির অতৃপ্তি তাহাদের জীবনকে জ্বালাময় করিয়া তোলে।

নীরদা লাবণ্যময়ী অপ্সরী নহে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সাধারণ রূপগুণসম্পন্না কন্যা। প্রথম যৌবনে হয় ত এই পত্নীকে সে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সে ভালবাসা পত্নীর মাঝখানে শেষ হইয়া যায় নাই। গভীর আকুলতা যোগেশের মনে লালসা জাগাইয়া তোলে। অপ্রাপ্য এক মানসীর পিছনে তাহার চিত্তকে ছুটাইয়া লয়। পত্নীর আদর যোগেশের নিকট ভাল লাগিল না। সে কঠোরভাবে উত্তর দিল "একটা ছবি আঁক্‌ছি, দেখ্‌তেই পাচ্ছ।"

"কথার ছিরি দেখ্‌লে রাগ হয়, এলেম তোমাকে একটা খবর শোনাতে। তা' অমন যদি করো, চলে' যাচ্ছি।"

"কি খবর শুনি!"

"আমাদের পাশের বাড়ীতে যে নূতন ভাড়াটিয়া এসেছিল, তাদের বড় ছেলেটা চাক্‌রী বাক্‌রী না পেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে। হুলস্থূল পড়ে গেছে। তুমি একটা বার যাও না! ওদের ঝি এসে কাঁদতে লেগেছে।"

"না, ও সব মায়াকান্না শুন্‌বার অবসর আমার নেই। চাক্‌রী পায়

নি, তাই ব'লে পাগ্‌লামি ক'রবার প্রয়োজন ছিল কি? কে কোথায় কি ক'র্‌ছে, তার খোঁজ নিতে গেলে আমার চলে না।"

নীরদা পতির এই নির্ম্মমতায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাগ করিয়া বলিল, "তুমি মানুষ না পশু? পাশে একটী লোক অভাবের যাতনায় আত্মহত্যা করেছে; তার জন্য তোমার একটুও দুঃখ বোধ হচ্ছে না?"

কাজ বন্ধ করিয়া যোগেশ উত্তর দিল, "সংসারে অনেক দুঃখ ও কান্না আছে। তার জন্যে চোখের জল ফেল্‌তে হ'লে একটী গঙ্গানদীর সৃষ্টি হ'ত। আমি আমার কাজ নিয়েই খুসী। অপরে কে কি ক'র্‌ল, তার জন্য মাথা ব্যথা ক'রে কি হবে?"

উত্তেজিতকণ্ঠে নীরদা কহিল, "তা বৈ কি! কোথায় কোন্ বান্ধবীর জন্মোৎসব। তার জন্য ছবি এঁকে সময় নষ্ট হ'লে কোনও দোষ নেই?"

যোগেশ পরুষভাবে জবাব দিল, "দেখ নীরদা! তুমি যা' বোঝ না, তা' নিয়ে কথা ব'ল্‌তে এসো না।"

ইন্দিরার জন্মোৎসবের ছবি আঁকিয়া সময় নষ্ট হইতেছে, ইহাতে যত ব্যথার কারণ ছিল, তাহার চেয়ে বেশী ছিল ঈর্ষ্যা। আপনার স্বামী অন্য একজন তরুণীর জন্য কিছু করিতেছে, ইহা কোন নারীই বোধ হয় পছন্দ করে না। কাজেই নীরদা সুযোগ পাইয়া যোগেশকে ভর্ৎসনা করিল, "তোমার কেরামতি বোঝা গেছে। বাজে কাজ ক'রে সময় নষ্ট ক'র্‌তে পার, আর একজন পড়শীর দুঃখে সময় নষ্ট ক'র্‌তে হ'লে তোমার সুযোগ নেই, তোমার সময় নেই!"

দাম্পত্যকলহ কোথায় শেষ হইত কে জানে, কিন্তু দৈব আসিয়া

বাধা দিল। ভৃত্য আসিয়া জানাইল, "সত্যব্রত দেখা করিতে আসিয়াছে।" নীরদা পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সত্যব্রত প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি ভায়া! তোমাদের মধুরালাপ ভঙ্গ করার অপরাধ মাপ ক'র্বে ত?"

যোগেশ চেয়ার আগাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "মধুর আলাপই চল্‌ছিল বটে!"

সত্যব্রত প্রশ্ন করিল, "কেন, ব্যাপার কি?"

যোগেশ বলিল, "দেখ না ভাই, এই ভোর বেলাতে ছবির রূপ ফোটাতে বসেছি, এমন সময়ে গৃহিণী এসে জানালেন, কোথায় কে মরেছে, তার সন্ধান নিতে। বল ত ভাই, কবি যে, শিল্পী সে, সে কি পৃথিবীর দুঃখ বেদনার পিছনে ছুট্‌লে কোন বৃহৎ কিছু করতে পারে? সংসারে দুঃখ অনন্ত, বেদনা অনন্ত, তা ভেবে ভেবে পেঁচা হয়ে বসে থাকায় লাভ কি? ততক্ষণ আমি যে রসের সৃষ্টি কর্‌চি সে পৃথিবীতে আনন্দ ও শক্তি ছড়াবে।"

সত্যব্রত বলিল, "শিল্পীর রসলোকে আমার স্থান নেই ভাই, তাই তোমার কথা হয় ত ঠিক মত বুঝ্‌বো না। কিন্তু কি নিয়ে এত কলহ উঠ্‌ল?"

"ব্যাপার বেশী কিছু নয়। সংসারে সব সময় যা ঘট্‌ছে, তেমনি একটী দুঃখের কাহিনী।"

"সবটা খুলেই বল না ভাই?"

"আমাদের পাশের বাড়ীতে বীরভূম হ'তে একটী পরিবার এসে বাসা নিয়েছিল। বছর ত্রিশের একটী ছেলে, তার স্ত্রী আর মা। এই নিয়েই

ছোট-খাট একটী সংসার। ছেলেটী নাকি বি, এ পাশ। চাকরীর জন্ম আজ মাসখানেক ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে গেছে। শুনছি, চাকরী না পেয়ে ক্ষোভে ও দুঃখে কাল সে বিষ খেয়ে মরেছে।"

সত্যব্রত ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কাল! কখন!"

যোগেশ বলিল, "জানি না, সমস্ত খোঁজ ত নেইনি ভাই।"

সত্যব্রত বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া যোগেশের ব্যথাহীন মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিল, "না ভাই, আমি রসিক নই, রসতত্ত্ব বুঝতে পারি না। কিন্তু মানুষের এত বড় দুঃখে যদি মানুষের মন বিদীর্ণ না হয়, তা হ'লে আর কিসে হবে জানি না? আমি এখন উঠি। এই অনাথ পরিবারের এখুনি খোঁজ নিতে হবে।"

সত্যব্রত তড়িৎপদে যাইতেছিল। যোগেশ বাধা দিয়া বলিল, "যেয়ো না হয়, কিন্তু কি জন্য এসেছিলে, তা'ত ব'ললে না।"

চলিতে চলিতে সত্যব্রত উত্তর দিল, "একটু কাজ ছিল। সে না হয় আর এক দিন হবে।"

যোগেশ মনে মনে বলিল, "এই মেয়েলিপনা ক'রেই বাঙালীজাত মরতে বসেছে। পৃথিবীতে এসে দুঃখের ভারে যারা নুয়ে পড়ে, তাদের দুঃখে সহানুভূতি করাই উচিত নয়। মানুষ যারা, তারা বিপদের বেড়াজাল কেটেই সত্যকে বরণ ক'রবে। দুঃখ আছে ব'লেই পৃথিবীতে সুখ আছে। অভাব ও দারিদ্র্য দেখে যারা কাঁদবে, তারা কাঁদবেই। পৃথিবীর মাহাত্ম্য দুঃখ ও সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত আছে।"

অন্তরাল হইতে নীরদা বন্ধুদ্বয়ের কথাবার্তা শুনিতেছিল, বাঙালীর ঘরে ঘরে এরূপ আড়িপাতা চলে, অতএব নীরদার দোষ দেওয়া চলে না।

সত্যব্রত চলিয়া গেলে নীরদা হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল, "দেখলে, তুমি যদি মানুষ হ'তে, তাহ'লে তুমিও তোমার বন্ধুর মত, দুঃখীর সাহায্য ক'রতে ছুটতে।"

"চুপ কর, আমায় কাজ ক'রতে দাও।"

"কাজ? কি কাজ হচ্ছে তোমার?"

"সে বিচার ক'রে তোমার কাজ কি? অব্যাপারে ব্যাপার করতে এসো না। তোমাদের যে কাজ, সে কাজ নিয়ে থাক। অকাজ ডেকে এনে দুঃখকে ঘরে তুলো না। একজন মরেছে ব'লে আমাদের ম'রতে হবে তা নয়। আমরা কি করব! পৃথিবী জোড়া এত কষ্ট ও দুঃখ যে, তোমার ভগবানের সাধ্য নেই তা দূর করে। যতক্ষণ আমি এই সব বাজে কাজে মন দেব, ততক্ষণ হয় ত এমন একটা কিছু সৃষ্টি ক'রতে পারি, যা যুগ যুগ পৃথিবীকে আলো ও আনন্দ বিতরণ ক'রবে।"

যোগেশের কথার মূলে কিছু সত্য ছিল। দুঃখবাদ নিয়ে জীবন চলে না। মানুষ তাহার চারি পাশে হাসি, গান ও কৌতুকের বীজ ছড়াইয়া দিবে, যে যত আনন্দজ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে, সে ততই ভাগ্যবান, কিন্তু তাই বলিয়া শুধু স্বপ্নলোকে উড়িয়া বেড়াইলে মানুষের চলে না। দুঃখকে গ্রহণ করিয়া দুঃখকে জয় করিতে হইবে, দুঃখকে এড়াইয়া নয়। নীরদা এ সব তর্কে যোগেশকে হারাইবার শক্তি রাখে না, কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল।

৭

শীতাংশুর কথা ইন্দিরার মনে বিপ্লব জাগাইয়াছিল। যৌবনের লাবণ্য তাহার সমস্ত দেহে বসন্তের আবির্ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। তন্বী ও গৌরী ইন্দিরা অঙ্গসৌষ্ঠবে ও কান্তিতে সত্যই ইন্দিরার মত দেখিতে হইয়াছিল। কোমল কেশদাম কপোলে আসিয়া খেলা করে, পিঠ বাহিয়া জানু স্পর্শ করে। জ্যোতিভরা চোখে সে যখন চাহে, চারি দিকে মাধুর্য্যের মহোৎসব জাগে। বসিয়া বসিয়া ইন্দিরা শীতাংশুর কথা ভাবিতেছিল। জ্ঞান হইবার পরে সে পিতামাতার প্রণয়-মধুর দাম্পত্য-জীবন দেখে নাই। যতদূর স্মরণ পড়ে, সব সময়েই সে পিতা ও মাতার মাঝখানে বিরাট ব্যবধান দেখিয়া আসিয়াছে। ঝি-চাকরের প্রশ্নালাপের মাঝে সে নর ও নারীর যৌন সম্বন্ধের জ্ঞানের প্রথম আভাস পায়। ছোট বয়সে পুতুল লইয়া যখন বর ও বধূ খেলা করিয়াছে, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা রহস্যের ভাব জাগিয়াছে। কিশোর বয়সে ক্বচিৎ-দৃষ্ট কোনও কিশোরী বধূর আচরণ দেখিয়া তাহার মনে কখনও কখনও আবেগ জাগাইয়াছে। ইহাকে ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা চলে না। এ যেন অজানা এক পিপাসা। মাঠের পারে বনের ধারে কোথায় যেন ফুল ফুটিয়াছে, বাতাসে তাহারই গন্ধ ভাসিয়া আসে। এ যেন তেমনই একটা অনুভূতি। যখনই এ অনুভূতি জাগে, সর্ব্বশরীর তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। সে ভাবে এই অজানাকে না পাইলে তাহার যেন চলে না, তাহাকে পাইলে যেন স্বর্গ মিলে।

বয়স যতই বাড়িতে লাগিল নর-নারীর যৌন সম্বন্ধের অপরিচিত

রূপ লইয়া সে নানা স্বপ্ন গড়িয়া চলিল। সমবয়সী মেয়েদের তর্ক ও পরিহাস কখনও কখনও তাহার মনে নানা ভাব জাগাইত। সত্যকে না জানিয়া সে নানারূপ কল্পনা করিয়া লইত। বয়স বাড়িবার সঙ্গে, উপন্যাস ও কবিতা পড়িয়া পড়িয়া ইন্দিরা চঞ্চল হইয়া উঠিত। যুগে যুগে কালে কালে কবিরা ললিত মধুর পদ দিয়া, মানুষের আদিম লালসাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দিরা তাহার মধ্য দিয়া খাঁটী সত্যকে জানিতে চেষ্টা করিত।

বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন,

> "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর,
> প্রতি-অঙ্গ লাগি কাঁদে, প্রতি-অঙ্গ মোর।"

ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ না খুঁজিয়া, ইহার মধ্যে রক্ত মাংসের যে অনাদি আকর্ষণ মানুষকে পাগল করিয়া তুলে, ইন্দিরা তাহারই সন্ধান খুঁজিত। বয়স আরও একটু বাড়িলে সে নিজেকে উপন্যাসের নায়িকা কল্পনা করিয়া লইত এবং পরিচিত নানা যুবককে আপনার প্রণয়ী কল্পনা করিয়া নানা স্বপ্ন দেখিত।

কিন্তু এসব হিজিবিজি জ্ঞান থাকিলেও ইন্দিরার এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান ছিল না বলিতে হইবে। কারণ পুস্তকস্থা বিদ্যা এখানে সত্যকে ঠিক জানিতে দেয় না, প্রত্যেক মানুষকে পস্তাইয়া এই সত্য শিখিতে হয়।

শীতাংশুর কথা আজ তাই ইন্দিরার মনে আগুন ধরাইয়া দিল। ইন্দিরা যৌন-জীবনের রহস্য ও মায়ার কথা ভাবিতেছিল, এমন সময়ে রেখা ও সুলেখা আসিল।

কথা বলিতে পারিলে হৃদয়ের জমাট ভার নামিয়া যায়। সখীদের

আগমন তাই ইন্দিরাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। সে সখীদের সম্বোধন করিয়া আদর করিয়া বসাইল। ঝিকে চা ও খাবার আনিতে বলিয়া সখীদের সহিত গল্প আরম্ভ করিল।

রেখা ও সুলেখা রায়েদের বাড়ীর দুই মেয়ে। রেখা গৃহকর্ত্তা শ্রীনাথ রায়ের প্রথমা কন্যা, সুলেখা শ্রীনাথের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীপতির প্রথমা কন্যা। দুজনে সমবয়সী, ভগ্নীদের মধ্যে কোনও বাধার আড়াল ছিল না।

রেখা প্রশ্ন করিল, "তাহ'লে সই, কোন্ ভাগ্যবানের গলায় লক্ষ্মী এবার জয়-মাল্য দেবেন?"

ইন্দিরা প্রশ্নকে এড়াইয়া বলিল, "ভাগ্যবানের গলায় মালা দেওয়াই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য?"

সুলেখা বলিল, "তা বই কি, আমি তো চাই, একজন আমাকে ভালবাসুক, যে ভালবাসার সুধা-সমুদ্রে আমি ডুবে থাকব।"

ইন্দিরা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু ধর, তোমার মনে যদি ভালবাসা না জাগে, তখন?"

সুলেখা বলিল, "সে কেন, আমি যাকে ভালবাসব, সেই ত আমায় ভালবাসবে—ভালবাসার প্রতিদানেই ত ভালবাসা বেড়ে ওঠে।"

ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু মনে করলেই কি ভালবাসা যায়? একজন অজানা লোক হঠাৎ এসে দেখা দিল, সে চিলের মত উড়ে এসে সমস্ত বিল জুড়ে বসবে একি সম্ভবপর হয়?"

রেখা এবার ভগ্নীর সহায়তা করিল—"হবে না কেন, ভগবান আমাদের হৃদয়ে যে এই মাণিক লুকিয়ে রেখেছেন।"

ইন্দিরা ঝির দ্বারা আনীত খাবারগুলি বন্ধুদের দিয়া চায়ের পেয়ালায়

চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "জীবনে তা কি সব সময়ে হয়, ভালবাসা দিলেই কি ভালবাসা পাওয়া যায়। গল্প ও নাটকে ত রোজই পড়ছ বুকভরা ভালবাসার বদলে আমরা কেবলই গভীর উপেক্ষা পাচ্ছি।"

সুলেখা এবার সাহস সঞ্চয় করিয়া উত্তর দিল, "ভালবাসা ত ঠিক ব্যবসা নয়, ভালবাসা না পেলেও ভালবাসা দিয়ে যাবে, এই ত নারীর সাধনা।"

ইন্দিরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে কৌতুকভরা স্বরে বলিল, "নে তোর পাকামি রাখ্, যেন নাটক ক'রতে বসেছিস্। এসব কথা বই লিখতে সাজে, আসল জীবনে মেলে না।"

সখীরা কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। আহার শেষ হইলে তাহারা বাগানে বেড়াইতে চলিল।

প্রসঙ্গক্রমে ইন্দিরা বলিল, "শীতাংশু বাবু এবার অদ্ভুত এক বই লিখেছেন।"

সুলেখা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বই, সই?"

ইন্দিরা বলিল, "বইটার নাম 'অহল্যার শাপ-মোচন', কিন্তু তা বল্‌লে বইটার মর্ম্ম বুঝা যাবে না, এর ঠিক নামকরণ হ'ত 'নারীর শাপ-মোচন'।"

রেখা এবার প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"শীতাংশু বাবু বলতে চাইছেন, নারী যদি কোনও পুরুষের প্রেমে পড়ে, তাতে তার কোনও পাপই নাই, অহল্যাকে শাপ দেওয়া হয়েছিল ঋষির ধৃষ্টতা, শরীর সম্বন্ধ দিয়েই সতীত্বের পরিচয় নয়, মনের সম্বন্ধ নিয়েই তার বিচার ক'রতে হবে।"

সুলেখা জবাব দিল, "এসব বিলিতি মত আমাদের দেশে চলবে না ভাই, ব্যভিচারকে আমাদের শিক্ষা ও আদর্শ কখনই বরদাস্ত করবে না।"

ইন্দিরা গম্ভীর ভাবে বলিল, "কিন্তু এসব তোমার শেখা বুলি, মনের কথা কখনই নয়। পুরুষ যদি বহু নারীর পতি হয়েও সতী থাকে, নারীর পক্ষে দোষ কি? কামনা যেমন পুরুষকে মত্ত করে, নারীকেও তেমনই করে, অতএব পুরুষের বেলায় কিছু না, আর নারীর বেলায় বজ্রনিগড়, এ তোমার কোন্ ন্যায়শাস্ত্রে ঠিক বলবে?"

রেখা বলিল, "ভাল কি মন্দ তা বিচার করতে চাই না, কিন্তু এসব বিশ্রী কথা আমাদের সইবে না। পুরুষের কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে চাই, কিন্তু তাই ব'লে কুকুর কামড়ালে তাকে ফিরে কামড়াতে হবে, এ নীতি আমরা মানতে চাই না।"

সুলেখা বলিল, "না বোন, এ নাটক অভিনয় করা চলবে না, মনে মনে আমরা যতই না পশ্চিমের দিকে চেয়ে রই, আমাদের গোপন মর্ম্মে সতী-সাবিত্রীর সংস্কার রয়ে গেছে, এসব জিনিস চলবে না।"

ইন্দিরা চিন্তিত মনে বলিল, "তাহ'লে অভিনয়ের কি ব্যবস্থা করা যায়।"

রেখা সোল্লাসে উত্তর দিল, "তার জন্য ভয় নেই ভাই, সবাই মিলে যাহ'ক একটা ঠিক করা যাবে'খন, কিন্তু তাই ব'লে এসব আন্‌কোরা বিলেতী সুরা চালানো চলবে না।"

ইন্দিরা কথা কহিল না। সন্ধ্যার লঘুমেঘ পশ্চিম আকাশকে মধুর ও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সতী ও সাবিত্রীর সংস্কার কি, ইন্দিরা নীরবে তাহাই অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

পুরুষপরম্পরায় জাতির সভ্যতার এক একটা বৈশিষ্ট্য মানুষের মনে এরূপভাবে বদ্ধমূল হইয়া যায়, যে জন্মের সহিত জাতির প্রত্যেক নরনারী

তাহা যেন আপন সম্পৎ বলিয়া নিজের অন্তরে লাভ করে। রেখা ও স্নলেখার নিকট ভারতবর্ষের সংস্কৃতির এই বিশিষ্টতা যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, ইন্দিরার মনে তাহা করিতেছিল না। কিন্তু সখীদের সঙ্গে এ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

বাগানে শীতের দিনেও একটী সুন্দর গোলাপ ফুটিয়াছিল। রেখা তাহা তুলিয়া লইয়া ইন্দিরার খোঁপায় পরাইতে পরাইতে বলিল, "কিন্তু এত ভালবাসার আলোচনা কেন ভাই? রোগে ধরেছে নাকি?"

ইন্দিরা উত্তর দিল না। নীড়ে প্রত্যাগত একটী বিহঙ্গ মনের আনন্দে শিস দিয়া উঠিল। দিনান্তের লালিমা রাত্রির আসন্ন কালিমায় আপনাকে হারাইয়া বসিল।

৮

যোগেশের নিকট সত্যব্রত পরামর্শ লইবার জন্য গিয়াছিল। ইন্দিরার জন্মোৎসবের আমন্ত্রণ পাইয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। অভিজাত-সমাজে মেলামেশা তাহার ছিল না, কাজেই প্রথমে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবে ভাবিয়াছিল; কিন্তু যখন জানিল যে মিঃ গুপ্ত তাহার পিতৃবন্ধু, তখন সে কিছুতেই নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিল না।

বিপদের ও শোকের বার্ত্তা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। ছোটকাল হইতেই সত্যব্রত পরের দুঃখ শুনিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। নিরাশ্রয় পরিবারের এই গভীর বিপদের কাহিনী তাহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

সত্যব্রত যখন পৌঁছিল, তখন পুত্রহারা মাতা কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছিল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া তাহারা আসিয়াছিল। কলিকাতার জনসমুদ্রের মাঝে আশ্রয় মিলিল না, ক্লান্ত পুত্র জীবন-সংগ্রামে হারিয়া মাতা ও তরুণী বধূকে পথের পথিক করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এ গভীর শোকের কোনও সান্ত্বনা নাই। মানুষ অমর, একথা পুত্র-বিয়োগবিধুরা জননীর মনে কোনও রেখাপাত করে না। শোক নিষ্ফল, এ কথাও সে উপলব্ধি করে না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাই সে খুন হয়। মরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কিন্তু গভীর শোকের মাঝেও মানুষ মরিতে পারে না। মরণের বিষম ভয় মানুষকে কাবু করিয়া রাখে, সত্যব্রত যাইয়া দেখিল, পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া মাতা তারস্বরে বিলাপ করিতেছে, পাশে বধূ নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে।

আকাশের ছায়ে বনের কুসুম ফুটিতে চাহে। কাহাকেও সে দ্বেষ করে না, কাহাকে বাধা দেয় না, তথাপি কীট আসিয়া তাহাকে দংশন করে। তরুণী স্বামীকে সে সবে চিনিতে শিখিয়াছিল। জীবনের রূপ-রস-গন্ধ ও গান আপনার মোহ তাহার প্রাণে সবে মাত্র সঞ্চার করিয়াছিল। এমন সময়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল।

এ শোক চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলে। চীৎকার করিয়া ইহা প্রকাশ করা চলে না। বজ্রাহত তরুর মত নীরব নিস্পন্দ হইয়া, তাই বধূ কাঁদিতেছিল।

দর্শক ও কৌতূহলী পথিকের ভিড় জমিয়াছে, নানা জনে নানা কথা

বলিতেছে। ছিন্ন কন্থায় যুবক শুইয়া রহিয়াছে। তাহার পাণ্ডুর ও শীর্ণ মুখ দেখিলে দয়া জন্মে। সে যেন জীবনের কঠোর সংযমের জন্য প্রস্তুত নয়।

ভিড় সরাইয়া দিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে জড় করিয়া, কি করা যায়, সত্যব্রত তাহার ব্যবস্থা করিতে বসিল। একজন ভদ্রলোক বলিলেন যে, পুলিশে খবর পাইয়াছে এবং শীঘ্রই আসিয়া তদারক করিবে। সত্যব্রতের চমক ভাঙ্গিল। আত্মহত্যা করিয়াও নিস্তার নাই—জীবনের দুর্ব্বহ জ্বালাই শেষ নহে, সে জ্বালা শেষ করিলেও, আইনের নূতন জ্বালা আছে। খানিক পরে পুলিশের এক ইনস্‌পেক্টর আসিলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয় ও অমায়িক। ইতিহাস শুনিয়া তাঁহার নিজের অন্তরই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সত্যব্রতকে বলিলেন, "আপনি এঁদের যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন, আমি তদন্তটা সেরে নেই।"

সত্যব্রত বৃদ্ধাকে বলিল, "মা, ভগবানকে ডাকুন।"

উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন জীবন। সম্মুখে অন্ধকার, পিছনে অন্ধকার, বৃদ্ধা ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, সত্যব্রতের শান্ত-স্নিগ্ধ প্রসন্ন মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহে।

সত্যব্রত বলিল, "মা! আমাকে আপনার ছেলে মনে করে নিন্। আমার ঘরেই চলুন।"

দুঃখের দিনে, শোকের দিনে কে তুমি দেবতা! একদিন পূর্ব্বে আসিলে হয়ত বেদনার এই তিক্ত অভিনয় হইত না। বৃদ্ধা আচ্ছন্ন হইয়া নিরুত্তর রহে। সমস্ত ব্যথার মধ্যেও নানা ভাবনা মনের মধ্যে বহিয়া যায়। যৌবন-লাবণ্য-ভূষিতা পুত্রবধূকে লইয়া যেখানে সেখানে

যাওয়া চলে না। অজ্ঞাত-কুল-শীল লোকের সহিত গিয়া না জানি কি বিপদ ঘটিবে কে জানে!

সত্যব্রতের অনুরোধ আবার চলে "মা, আজ আমার ওখানেই চলুন, তারপর আপনার যেখানে অভিরুচি সেখানেই যাবেন।"

বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। কান্না থামিলে কষ্টে ডাকে—"বাবা!" পরমুহূর্ত্তেই অশ্রান্ত কান্না বহিয়া চলে।

কিন্তু যাহারা নিরাশ্রয় পথের ভিখারী, তাহাদের বিচার চলে না। কাজেই শোক থামাইয়া বলিতে হয়, "বাবা, দুনিয়ায় আমাদের কেউ নেই।"

সত্যব্রত উত্তর দেয়, "না মা, ভগবান সকলের ব্যবস্থা করছেন। কেঁদে কোনও লাভ নেই।"

সত্যব্রত গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া বৃদ্ধা ও তাহার পুত্রবধূকে আপন বাড়ীতে লইয়া চলিল। তাহার কলিকাতার বাসায় কেহই ছিল না। পিতামাতা অন্য ভাই-ভগিনীসহ দেশের বাড়ীতে থাকেন, কেবল সে একাকী ঠাকুর ও চাকরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন কাটাইতেছিল। স্ত্রীলোকবিহীন গৃহে আসিয়া, বৃদ্ধা ও তরুণী বধূ অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবে মনে করিয়া, সত্যব্রত তাহাদের বাসার পুরাতন ঝিকে ডাকিয়া আনিল।

খোকাবাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, মোক্ষদা কাজ করিতে আসিল। কিন্তু বিপন্না বৃদ্ধা ও তাহার পুত্রবধূকে আশ্রয় দেওয়া সে পছন্দ করিল না। যে নিজে দুঃখী, সে অপরের দুঃখ বোঝে, এ কথা সব সময়ে সত্য নহে।

সত্যব্রত বিকালে যখন আপন পাঠ-কক্ষে বসিয়া পড়িতেছিল, মোক্ষদা আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু!"

পুস্তকের পাতা হইতে মুখ না তুলিয়া সে বলিল, "কি ?"

"ওদের এনে ফ্যাসাদ বাধিয়ে কি কাজ ? মা, বাবা এলে কি ব'লবেন !"

ঝির কথায় সত্যব্রত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সংসারে করুণার পথও সহজ নহে। দয়া করিব বলিলে দয়া করা চলে না। অনাথিনী দুইটী স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিতে না দিতে, মানুষ বাধা জাগাইয়া তুলে। কিন্তু এ ভাবনা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। পুলিশের নিকট হইতে খবর আসিল, "করোনার স্বেচ্ছামৃত্যু বলিয়া রায় দিয়াছেন। শবদাহের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।"

পুত্রের শেষকৃত্য করিবার জন্য বৃদ্ধাকে লওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া, বধূ নমিতাকে লইয়া সে নিমতলায় চলিল। কপোলে একরাশি সিন্দুর পরিয়া যখন নমিতা পতির চিতাশয্যায় অগ্নি দিতেছিল, তখন সত্যব্রত দেখিল নমিতা অতিশয় সুন্দরী।

আগুনের লেলিহান শিখার পাশে মূর্ত্তিমতী ব্যথার মত নমিতার শান্ত ও নম্র রূপ সত্যব্রতকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। নমিতা কাঁদিল না। শুধু পাষাণের ন্যায় নিশ্চল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া পতির শেষকৃত্য দেখিল। মানুষের শোকে সান্ত্বনা অমৃত প্রলেপ দেয়। বন্ধু ও আত্মীয় তাই মৃত্যুর পাশে পরম বান্ধবরূপে দেখা দেয়। শোকের অশেষ বেদনার মাঝে নূতন আশার কিরণ ছড়ায়। বিষাদিনী নমিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সত্যব্রত কথা খুঁজিয়া পাইল না। সে নীরবে বিস্ময়-মুগ্ধ চিত্তে মূর্ত্তিমতী বেদনার মত নমিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

নমিতার কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে পলকহীন দৃষ্টিতে অগ্নির

তাণ্ডবলীলা দেখিতেছিল। যখন কাজ শেষ হইল, তখন সত্যব্রত সাহস সঞ্চয় করিয়া ডাকিল, "চলুন!" নমিতা কথা বলিল না। পাষাণের কারা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নির্ঝরিণী যেমন সহসা বেগে বাহির হইয়া পড়ে, তেমনই বেগে তাহার চক্ষু হইতে জলধারা বাহির হইয়া পড়িল।

বাহিরে তখন সান্ধ্য-প্রকৃতি আপন মাধুর্য্যে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছিল। পৃথিবীতে শোক আছে, প্রকৃতি তাহাকে মানে না। সে আপনার অমৃত-আনন্দ শোকে ও দুঃখে সমভাবেই ছড়াইয়া যায়।

৯

সংস্কৃতকন্যাদের নায়িকার ছবির মডেল হইবার জন্য যোগেশ ইন্দিরাকে অনুরোধ করিয়াছিল। ইন্দিরা সে অনুরোধ ঠেলিতে পারে নাই। সেদিন বৈকালে মডেলের জন্য প্রথম অধিবেশনের আয়োজন। যোগেশ বলিয়াছে যে, ইন্দিরাকে সরল সহজ হইয়া থাকিতে হইবে, তাই নিরূপিত সময়ে ইন্দিরা আপন কক্ষে বসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিল,

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে।
বাতাস জল, আকাশ আলো, সবারে কবে বাসিবে ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তারা বাসিবে নানা সাজে!
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব, সবারে যাব তুষি';

জীবনের চলস্রোত

রয়েছ তুমি, একথা কবে, জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে।

যোগেশ হাতে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল, পাশের শোফায় বসিয়া সে বিহ্বল-দৃষ্টিতে তরুণীর গান শুনিতে লাগিল।

নারীর সুন্দর মুখ মায়াকাঠির স্পর্শ দিয়া যায়। শিল্পী যোগেশ ইন্দিরার লাবণ্য-উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দিরা গান থামাইতে যাইতেছিল। যোগেশ বলিল, "না, তুমি গান থামিও না। গানের সঙ্গে সঙ্গে তোমার লাবণ্য যেন ঠিক্‌রে পড়ছে, আমি শুধু বিস্মিত হয়ে তাই দেখছি—তুমি কি সুন্দরী ইন্দিরা!"

ইন্দিরার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কথার সাথে সাথে মোহের সম্মোহন আকর্ষণ যেন অন্তর বিঁধিতে চায়।

যোগেশ তুলি লইয়া ছবি মেলিয়া বসিল। গান থামাইয়া ইন্দিরা বলিল, "তোমার কতক্ষণ লাগবে যোগেশ দা। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতে পার্‌ব না।"

"চুপ ক'রে থাকতে হবে না, গল্প করতে পার। মনটাকে খুসী ক'রে রাখা চাই—খুসী না থাকলে, তোমার অনিন্দ্যসুন্দর রূপের মাধুরী ফুটবে না, কিন্তু—"

"কি বলছ যোগেশ দা!"

"যদি কিছু মনে না কর ত বলি, মৎস্যকন্যা আলুলায়িতা কুন্তলা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—তার মুক্ত বক্ষে প্রভাতের প্রথম সূর্য্য এসে পড়ে' তাকে অপরূপা করেছে—এই আমার পরিকল্পনা, তুমি যদি—"

ইন্দিরা কথা শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, বলিল, "না যোগেশ দা! তাও কি হয়, সে আমি পারব না, আমার ভয়ঙ্কর লজ্জা করবে—"

যোগেশ খানিক চুপ করিয়া রহিল, পরে মিনতির সুরে কহিল, "লজ্জার চেয়ে আর্ট বড়, এই ছবিটির জন্য আমি প্রাণপণ করছি—এই ছবিই আমার সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন হবে।"

ইন্দিরা কি বলিবে, ভাবিয়া পায় না। চুপ করিয়া রহে। যোগেশ ইন্দিরার মানসিক দ্বন্দ্ব অনুভব করিয়া বলে, "তোমায় একেবারে নগ্ন বসে থাকতে হবে না—তোমার কালো চুলের রাশ পিঠে ফেলে—নীলার মত রঙের একটা ব্লাউস ঢিল ক'রে পরে' দাঁড়ালেই চলবে—"

"চুল খুলে না হয় দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু বে-আব্রু হতে পার্‌ব না—"

যোগেশ উত্তর দিল—"ওটা ফ্যাসানের উপর নির্ভর করে, মেম-সাহেবেরা ত ঐরকম ক'রে পরে—তাতে ত তারা লজ্জা পায় না। আচ্ছা, আজ নয় থাক, কাল ভাল ক'রে ভেবে দেখো।"

"এতে আর ভাব্‌বার কি আছে?"

যোগেশ তরুণীর সংশয়-ব্যাকুল চোখে চোখ মিলাইয়া, স্মিতহাস্যে উত্তর দিল, "আর্ট ত একটা সখের জিনিষ নয়, ভাবীকালের মাঝে এই ছবি বেঁচে থাকবে, অপ্সরীর মত রূপ, সে ত তোমার মাঝেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না, বিশ্বমানবের চোখের সামনে সেই রূপদ্যুতি চিরকালের জন্য জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্বলবে, কথাটা ভেবে দেখো।"

ইন্দিরা উত্তর এড়াইবার জন্য বলিল, "চা আনি।" চা আসিলে, গল্প চলিল। ইন্দিরা যোগেশকে বলিল, "শীতাংশু বাবু ঠিক আপনার মত কথাই বলেন।"

"তা ত বলবেন, আমরা এ যুগের মানুষ—আমাদের মাঝ দিয়েই ত যুগবাণী ফুট্‌বে।"

কথাটি আলোচনার সুযোগ পাইয়া ইন্দিরা খুসী হইয়া উঠিল, "কিন্তু একথা আমাদের মনে যে আঘাত দেয়!"

"তা' দেবে। নূতন কথা সহজে হজম হয় না। আমাদের দেশে একদিন নারীর অবরোধজীবন ছিল তার গৌরবের জিনিষ। যাঁরা সেখান থেকে নারীকে জীবনের চৌরাস্তায় এনে দাঁড় করান, তাঁরা অনেক দুঃখ অনেক গ্লানি পেয়েছেন।"

ইন্দিরা কহিল, "স্বাধীনতা আর স্বৈরাচারে তফাৎ আছে।"

"তখনকার দিনে এই স্বাধীনতাকে স্বৈরাচার বলত; আর এক শতাব্দী পরে তুমি যাকে স্বৈরাচার বলছ, লোকে তাকে মুক্তি বলবে।"

ইন্দিরা অবাক্ হইয়া ভাবে—কি উত্তর করিবে, বুঝিয়া পায় না। যোগেশ চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া বলে, "আজ উঠি, কাল আবার আস্‌ব এই সময়েই—অসুবিধা হবে না ত?"

"না, অসুবিধা আর কি, তবে—"

"বুঝেছি, ব্যাপারটা তোমার কাছে অশোভন ব'লে মনে হচ্ছে—এতে অশোভনতা কিছুই নেই। এ যুগ মুক্তির যুগ, মানুষকে তার সকল সংস্কার, সকল বন্ধনের নাগপাশ থেকে উদ্ধার করবার সাধনাই যুগ-সাধনা!"

"মুক্তির বাণী আন্‌ছেন, না মৃত্যু আন্‌ছেন, সেইটাই ত ভাব্‌বার বিষয়।"

যোগেশ রঙের বাক্‌স সাজাইতে সাজাইতে কহিল—"খাঁচায় যে

পাখী থাকে, সে উড়্‌তে ভয় পায়—এটা বন্ধনের সংস্কার। উড়্‌বার আনন্দের খবর পেলে, নীলাকাশের মুক্তির আস্বাদ চেখে সে আর খাঁচায় ফির্‌বে না।"

ইন্দিরা বক্তার সাহস-দৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সেখানে কোনও জড়তা নাই—ভয় বা অবিশ্বাসের কুণ্ঠা নাই। ইন্দিরা বলিল, "ভেবে দেখ্‌ব যোগেশ দা!"

চলিতে চলিতে যোগেশ বলিল, "ভেবে দেখ্‌বে বই কি, তোমরাই নূতনের অগ্রদূত, জীবনের পরিস্ফুট মুক্তিকে ত ফুটিয়ে তুলবে।"

যোগেশ চলিয়া গেলে, ইন্দিরা কক্ষে বসিয়া ভাবিতে বসিল। সত্যই ত ইহাতে অন্যায় কোথায়? তাহার মূর্ত্তি চিরকালের জন্য মানুষের ঘরে সৌন্দর্য্যের জয়-ঘোষণা করিবে—একথা ভাবিতেও উল্লাস হয়। ইন্দিরা ভাবে, কাল আর আপত্তি করিবে না, আবার ভাবে, না তাহা কখনই সম্ভব নয়। সংস্কার ব'লে সম্ভব নয়। লজ্জা নারীর ভূষণ, সে ভূষণ নারী ফেলিতে পারে না। কিন্তু গৌরব-লিপ্সা জীবনের সকলের চেয়ে কঠোর দুর্ব্বলতা।

১০

যৌবনে মানুষের মনে অজস্র প্রাচুর্য্য জন্মে। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র আবেষ্টন মানুষের বর্দ্ধমান চিত্তকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, যৌবনের দিনে তাই মানুষ কিছু করিবার বা গড়িবার স্বপ্ন দেখে। যুবক-প্রাণে যে অবাধ উচ্ছ্বাস জাগে, তাহা কূল প্লাবিত করিয়া অকূলে ধাবিত হয়।

যুবকেরা তাই চিরদিন নূতন আদর্শ, নূতন কল্পনা দিয়া, পৃথিবীকে যুগে যুগে নূতন করিয়াছে।

সত্যব্রতের মনে, যৌবনের এই অকারণ, আবেগ কাজ করিয়া চলিয়াছিল। সমস্ত ছাত্র-জীবন ধরিয়া সে স্বপ্ন দেখিয়াছে, বাঙালীর জীবনের পুঞ্জীভূত অন্যায় ও দারিদ্র্য সে দূর করিবে। নিরন্ন ও নিপীড়িতের জন্য সে সাধনা করিবে। বাঙালীর জীবন কত ক্ষুদ্র-পরিসর। চারিদিকে কেবল বাধার পাহাড়। জাতিভেদ, কুসংস্কার, দেশাচার, শাস্ত্র-শাসন, এমনই কত দৌরাত্ম্য ভূতের মত আমাদের মনকে পিষিয়া ফেলে। সত্যব্রত দিনের পর দিন কল্পনা করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর অন্তরের মর্ম্মভেদী কান্না দূর করিবে।

রসায়নে এম, এ পাশ করিয়া, সুবিধাজনক চাকুরী পাইয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া, সাধনা-কঠোর নব ব্যবসায়কে সে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহার কারখানায় সে নিরন্ন ও নিরাশ্রয়দের আশ্রয় দিয়া কর্ম্মী করিয়া লইয়াছে।

সত্যব্রত ভাবিত, ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জীবনে উচ্চতা লাভ করিয়াও, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি করিবার নির্দ্দেশ পাইয়াও, সাম্যকে ও মৈত্রীকে জীবনের প্রাত্যহিক সত্য করিতে পারে নাই। অথচ বর্ত্তমানের যুগে দেশের মনে শূদ্রভাব বজায় রাখিলে, ভারতবর্ষের প্রগতির কোন আশা নাই।

তাই মনে মনে সে পশ্চিমের সাম্যবাদকে পছন্দ করিত এবং ভারত-বর্ষের বিশেষ আচারের মধ্যে, কেমন করিয়া মানুষের বিশেষ অধিকারের বাণী প্রচার করা যায়, তাহার পথ খুঁজিত। সত্যব্রত ভাবিয়া দেখিয়াছিল, য়ুরোপের মন্ত্র হুবহু নকল করিয়া ভারতবর্ষ কখনও বড় হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের সাধনার যে বিশিষ্ট রূপ আছে, তাহার আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া বিজাতীয় মনোভাব ভারতে কখনও দৃঢ়মূল হইতে পারে না, ইহা সে বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছিল।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতাকে সত্যব্রত তাই আপন পাথেয় করিয়া, নবযুগের মন্ত্র প্রচার করিত। সে কল্যাণ-মন্ত্র প্রীতির ও মৈত্রীর, সাম্যের ও সমন্বয়ের। ভারতবর্ষ তাহার শ্যামস্নিগ্ধ তপোবনে, একদিন বিরাট্ মনের অনুভূতি পাইয়াছিল ও জলদমন্দ্রস্বরে বলিয়াছিল, "মা ভৈঃ, মানুষ অমৃতের পুত্র, ঈশ্বরের শক্তিতে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিশ্বকে দেখিয়া, ত্যাগসুন্দর ভাগবত জীবনযাপন করিলেই মুক্তি মিলিবে।" সেই ব্রহ্মদৃষ্টি আজ সকলের জীবনে প্রস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে।

আচারের বেড়াজালকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে আজ এই প্রাচীন অমৃতময় ঐক্য ও মিলনের বাণী বুঝাইতে হইবে। সমস্ত মানুষকে পরিবর্দ্ধমান ব্রহ্মশক্তি মনে করিতে পারিলে,ভেদবুদ্ধি ও বিরোধ তিরোহিত হয়, প্রেমের স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ পৃথিবীকে মধুময় করিয়া তোলে।

ভাবের তরঙ্গদোলায় এমন করিয়া যখন সত্যব্রত দুলিতেছিল, তখনই নমিতা ও তাহার শাশুড়ী দেখা দিল। নমিতার বিষণ্নমূর্ত্তির মধ্যে সত্যব্রত এক নূতন জ্যোতিঃ দেখে, তাহার মনে হয় এমন অনিন্দ্যকান্তি পৃথিবীর ধূলায় ক্লিষ্ট হইতে জন্মায় নাই। তাই সে নমিতাকে আপন আশ্রয়ে রাখিয়া জীবনের বাত্যাঘাত হইতে রক্ষা করিতে চাহে। কিন্তু নমিতাই তাহার মতলব বদল করিয়া দিল ।

দিনের পর দিন আসে। আবার যায়। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমের তটে লুকায়। সন্ধ্যামালতীর গন্ধে বাতাস ভরে। আকাশ তারায়

হাসে। আবার ভোরের আলো পূবে জাগে, অমলকমলদল কিরণ-দেবতাকে আহ্বান করিয়া লয়। এমন করিয়াই অনাদিকাল আপন লীলা করেন।

নমিতার স্বামীর মৃত্যুর পর দেড় মাস হইয়াছে। শোকের সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া থাকিলে চলে না, জীবনের কঠোর আহ্বান বারে বারে আসিয়া হাতছানি দেয়। নমিতা সেদিন সত্যব্রতকে তাই বলিতেছিল—"দেখুন, আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন, এখন যাতে আমরা দাঁড়াতে পারি, তার কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

নমিতা আর লজ্জানত বধূ নহে, দুঃখ মানুষকে বাচাল করিয়া তুলে।

সত্যব্রত উত্তর দেয়, "কেন, আমার আশ্রয় কি তোমাদের ভার হয়ে উঠেছে! তুমি আমায় "তুমি" ব'লে ডেকো, "আপনি" ব'লে দূর ক'রো না।"

"তা হয় না ভাই—আপনি—"

সত্যব্রত বলিল—তাহ'লে আমি এখন উঠি—মোক্ষদার কাছে তোমার কথা জানাবে—

"তোমার আশ্রয় আমাদের অক্ষয় সম্পৎ, কিন্তু ভগবান সবাইকে কাজ ক'র্‌তে দিয়েছেন, আমাকে কিছু কাজের সন্ধান এনে দাও; নইলে যে জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠ্‌বে।"

বক্তার ম্লান-মধুর মুখ-জ্যোতির পানে, সত্যব্রত অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহে। ভাই বলিয়া ডাকিয়া সে সমাদর করিয়াছে। ইহাতে তখন তাহার মনে একটী পুলকের সাড়া লাগিয়া যায়।

"কি কাজ তুমি ক'র্‌তে পার্‌বে?"

"সামান্য কিছু লেখাপড়া জানি ভাই, তাতে যে কাজের যোগ্য, কোনও অসম্মান না হ'লে, তা ক'র্‌তে রাজী আছি।"

"আমাদের দেশে নারীর পক্ষে যোগ্য কাজ পাওয়া মুস্কিল। তোমাদের যদি মত হয়, তবে আমার কারখানায় তোমাদের একটু কাজের বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি।"

"সেই ভাল ভাই, তোমার আশ্রয়ে থাকৃতে পার্‌লে আমাদের কোন দুঃখই হবে না।"

যে কথা, সেই কাজ হইল। নমিতা ও তাহার শাশুড়ী কারখানার মধ্যে আশ্রয় লইল। অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীহীন কুটীরকে নমিতা শ্রীসম্পন্ন করিয়া ফেলিল। নমিতার কাজ হইল কারখানার প্রস্তুত শিশিতে যথাযথ নামের কাগজ লাগানো। এমন সুন্দর করিয়া সে কাজ করিতে লাগিল যে, সত্যব্রত অতিশয় আনন্দ লাভ করিল।

কারখানায় নানাস্থানের অনাথ-আতুর লইয়া কর্ম্মীদল গঠিত। কারখানার পাশে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে তাহারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন-ভাবে বাস করিত। সত্যব্রত লক্ষ্য করিল যে, নমিতার আগমনের সাথে সাথেই চারিদিকে যেন সৌন্দর্য্যের আবহাওয়া বহিয়া গেল। সবাই পৃথিবীর তুচ্ছ জীবনকে ধিক্কার না করিয়া, নিজের নিজের আচারকে শুদ্ধ ও মধুর করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে।

সত্যব্রত প্রতিদিন কাজ উপলক্ষে নমিতার সহিত দেখা করিত। নমিতার শাশুড়ী পুত্রবিয়োগব্যথায় জগৎ-সংসার ভুলিয়া বিকলের মত এক কোণে বসিয়া রহিত। অন্যদিকে নমিতা ও সত্যব্রতের আলাপ চলিত। সত্যব্রত অবাক্ হইয়া ভাবিত, পল্লী-জীবনের অন্ধকার ছায়ায় নমিতার মত

জ্যোতিষ্মান্ দীপ কেমন করিয়া ফুটিল? সত্যব্রত বলিত, "তুমি যে আমার কারখানাকে স্বর্গ ক'রে তুলেছ!"

নমিতা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিত, "আমি ত কিছুই জানি নে, শুধু মানুষকে শিখাতে চাই—অবশ হয়ে রইলে মানুষের চলে না। ভগবান যে এই আনন্দ-ভরা পৃথিবী দিয়েছেন, তাকে অনুভব ক'রেই মানুষকে ধন্য হতে হবে।"

সত্যব্রত বিস্ময়ে নমিতার পানে চাহে। শুক্লা সপ্তমীর চাঁদের মত সুন্দর কপোলের পানে চাহিয়া মুখ নত করিয়া লয়, অবাক্ হইয়া চিন্তা করে, কোমলশিরীষপেলব এই নারী শোক-সহনের বজ্রমন্ত্র কোথায় লাভ করিল! নমিতার মত নারীর সঙ্গ তাহার স্বামীকে কেন বীর্য্যবান্ ও শক্তিমান্ করিয়া তুলে নাই!

সত্যব্রত মনে করে, হয় ত স্বামী বর্ত্তমানে আপন শক্তিকে নমিতা উপলব্ধি করে নাই, মৃত্যুর দ্বার-প্রান্তে বসিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সত্য অগ্নির তাপে শুদ্ধ হইয়া খাঁটি সোণায় পরিণত হইয়াছে।

সত্যব্রত তাই মুগ্ধ হইয়া বলে, "বেশ! তোমার এই আশার বাণী এদের নিরাশ-প্রাণে সঞ্চারিত করো। আমার কাজের তুমি যথার্থ শক্তি দাও।"

নমিতা নীরব হইয়া রহে। বক্তার প্রশ্নের আন্তরিকতা অনুভব করিতে চাহে। পরে বলে, "আমার 'পরে বেশী আশা ক'রো না ভাই, তোমার নিজের অজেয় শক্তি আছে, তাই তোমার আশ্রয় হোক্, তোমার সাধনা তোমাকে বিজয়ী করুক।"

এমন করিয়া দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলে। সত্যব্রত

সারাদিনের মধ্যে প্রতীক্ষা করিয়া রহে, কখন নমিতার দেখা মিলিবে। নারীর যে মাধুরী, নমিতার মাঝে সত্যব্রত তাহা অনুভব করিতে শিখিল। যৌবনের যে রঙীন স্বপ্ন প্রতি যুবককে মানসীর সন্ধানে ঘুরাইয়া ফিরে, তেমনি একটী মোহ সত্যব্রতকে পাইয়া বসে।

ইহার কোথাও আসক্তির তীব্রতা ছিল না। এ যেন সৌন্দর্য্যের চরণে ভক্তির শ্রদ্ধা-সুবিমল অর্ঘ্য। পুরুষের অন্তরে যে রূপ-পিপাসা আছে, তাহাই হয় ত এই সম্বন্ধের উৎস-ভূমি। কিন্তু কলুষতার কালি কোথাও ইহাকে যেন স্পর্শ করে না।

আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু নর ও নারীর বন্ধুতা প্রীতির চক্ষে দেখে না। তাই বন্ধুর দল এই পবিত্র প্রীতির মাঝে দুর্ম্মুখের খোরাক যোগাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠে।

১১

নমিতা শান্তভাবে জীবনকে ফুল্ল ও পূর্ণ করিবার কাজে লাগিয়া গেল। কারখানাতে কতকগুলি ছোট ছেলেমেয়ে কাজ করিত। সে তাহাদিগকে পড়াইবার জন্য ছোট একটী পাঠশালা খুলিল। নমিতার সঙ্গ ছোট ছেলেমেয়েদের মনে এক অপূর্ব্ব মোহ জাগাইত। নমিতার মুখে দয়া ছিল, অথচ আদর ছিল না। তথাপি এই শিশুগুলি তাহাকে ভালবাসিতে লাগিল। নমিতার আদেশে ও অনুরোধে তাহারা জীবনের মধুর দিকের স্পর্শ লাভ করিল।

সত্যব্রত নমিতার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দিতেছিল। উৎসাহের

আতিশয্যে সে একদিন বলিল, "এদের মানুষ ক'র্‌বার জন্যে আমার অর্থ-ভাণ্ডার তোমার হাতেই রইল, তোমার যা খুসী তাই করো।"

নমিতা প্রশংসমান দৃষ্টি মেলিয়া বলে, "ভাই, তোমার প্রীতি ধন্য হ'ক, কিন্তু দয়া মানুষকে বড় করে না।"

সত্যব্রত কি বলিবে ভাবিয়া পায় না, নমিতার আনন্দ-ভাস্বর, শান্ত, সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহে।

নমিতা ক্ষণিক থামিয়া বলিতে লাগিল—"দুঃখীকে দয়া ক'র্‌লে তাকে ঘৃণা করা হয়, অবহেলা করা হয়। মানুষকে তার নিজের অসীম সম্পদে সম্পন্ন ক'রে তুল্‌লেই, পরহিতব্রত সার্থক হয়।"

দিন দুয়েক পরের কথা। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের আলোকে কারখানার পথ-ঘাট আলোকে ভরিয়া গিয়াছে। কুটীরের সম্মুখে একটী মোড়ার 'পরে বসিয়া নমিতা সেলাইয়ের কাজ করিতেছিল। সত্যব্রত আসিয়া একটা চেয়ার লইয়া বসিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া নানা কথাবার্ত্তা চলিল, পরে প্রসঙ্গক্রমে সত্যব্রত বলিল, "এমন ক'রে কতদিন জীবন কাটাবে ?"

নমিতা বক্তার কথার মধ্যে নূতনতর একটু কম্পন অনুভব করিল, কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই ধীরভাবে বলিল, "কেন, এই ত বেশ আনন্দে আছি ভাই !"

নমিতা ভাই কথাটীর উপর বিশেষ একটী জোর দিল। সত্যব্রত তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "যতই তোমায় দেখ্‌ছি নমিতা, ততই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। বাঙালীর জীবনের ছোট-পরিধির মধ্যে তুমি কেমন ক'রে জন্ম নিলে ? ভগবান তোমাকে সুযোগ দেন নি। অথচ

তোমার মধ্যে যে পরিপূর্ণ জীবনের উল্লাস দেখি, তাতে অবাক্ হয়ে যাই। তোমার ক্রিয়মাণ ও স্ফুটমান এই শক্তিকে আমি অনাদরে নষ্ট হ'তে দিতে চাই না। তুমি লজ্জা ক'রো না, নমিতা। তোমার জন্য আমি সব ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। তুমি যদি চাও, সম্পন্ন ঘরে উচ্চ ঘরে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা আমি ক'রতে পারি।"

নমিতা সত্যব্রতের আগ্রহে ও উত্তেজনায় ভীত হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি শান্ত স্বরে বলিল, "না ভাই, আমার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য কিছুই নেই। বাবা ছিলেন গরীব শিক্ষক, জীবনে পড়াকেই তিনি সার করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে হয়ত কিছু শিক্ষা পেয়েছি, যা তুমি প্রীতির চক্ষে দেখ্‌ছ। কিন্তু ভাই, বিয়েটাই ত জীবনের পরমার্থ নয়। নারী কি শুধু পরাশ্রয়ী হয়ে আপনাকে ফুটাবে? আপনার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের সমস্ত ব্যাঘাতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যে বিজয়ানন্দ আছে, তা কি কখনও সে ভোগ ক'র্‌বে না? না ভাই, তুমি আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, আমি বেশ আছি!"

সত্যব্রত খানিক চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিতে লাগিল, "না, নমিতা তুমি তোমার যোগ্য সুযোগ ও সহায় পাওনি, তোমার মেধা ও মনীষা এমন ক'রে ধূলায় গড়াগড়ি যাবে, এ আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। তোমার যদি অমত না হয়, তুমি যদি—"

লজ্জায় ও সঙ্কোচে সত্যব্রত কথা সমাপ্ত করিতে পারিল না। নমিতা সব বুঝিতে পারিল। সে হাস্য-কৌতুকের দ্বারা ব্যাপারটীকে লঘু করিবার জন্য বলিল, "কি ভাই, বিয়ের জন্য পাগল হয়েছ? আমায় ঘটকালির ভার দাও, আমি তোমার মানসী বধূ এনে দেব। কিন্তু

আমায় কেন প্রলোভনের ও অপমানের পথে চালাতে চাও ভাই? আজ যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে বিয়ে কর, তবুও লোকে ব'ল্‌বে, আমি কুহকিনী হ'য়ে তোমায় ভুলিয়েছি। না ভাই, সে লোক-গঞ্জনা থেকে তুমি আমায় উদ্ধার কর।"

সত্যব্রত ব্যথায় ও দুঃখে লাল হইয়া উঠিল, "নমিতা! তুমি আমায় বুঝ্‌লে না!"

নমিতা ক্ষণিক চাঁদের আলোকের পানে চাহিয়া রহিল, পরে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "না ভাই, তোমাকে আমি ভুল বুঝিনি। তোমার প্রীতি ও স্নেহ আমার অক্ষয় সম্পদ্, সেই প্রীতির জোরেই বল্‌ছি, তুমি বিপথে পা দিও না। বিধবা হ'লেই যে বাধ্য হয়ে ব্রহ্মচারিণী হতে হবে, এ মত আমি মানি না। যার ভোগবাসনা লেলিহান শিখার মত জ্বল্‌ছে, তাকে আট্‌কে রাখ্‌লে কখনই সুফল ফল্‌বে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের ও সেবার যে আদর্শ, তাকে আমি কিছুতেই ছোট ব'ল্‌তে পারি নে। তুমি যদি আমায় তোমার শয্যা-সঙ্গিনী হিসাবে না পেলে আমায় সাহায্য না কর, তাহ'লে তুমি আমার কাছে বড় ছোট হয়ে যাবে ভাই। কিন্তু যদি তোমার আশ্রয় আমার অটুট থাকে, আমার ত কোন অসুবিধাই নাই। ত্যাগের ও সেবার পথেই আমি জীবনকে সার্থক করে তুল্‌তে পারব।"

সত্যব্রত কি উত্তর করিবে, ভাবিয়া পায় না। হাতের লাঠিটী লইয়া অকারণে সে এখানে ওখানে আঘাত করে। পরে বলিতে থাকে "কিন্তু নমিতা, জীবনের পথ পিচ্ছিল, তোমার আশা ও আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি, তুমি কি এই তপস্যায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌বে না?"

"ভবিষ্যতে কি হবে, কে তা ব'ল্‌তে পারে? কিন্তু ভাই লালসার পথ লালসায় কখনও শেষ হয় না। কামনার রশ্মি সংযত ক'রেই ভোগ-পিপাসা নিরুদ্ধ হয়। সংযমের এই মহোচ্চ কল্পনার পিছনে ছুটে যদি বা ব্যর্থ হই, তাহ'লেও কোনই ক্ষতি নেই।"

পোষা একটী বিড়াল আসিয়া নমিতার কোলে লাফাইয়া পড়িল। নমিতা তাহাকে আদর করিতে করিতে বলিল—"পুরাতন দিনের পানে চেয়ে ভাই, লাভ নেই। বর্ত্তমান দিনের মানুষ বল্‌ছে, প্রিয়া আর পত্নী হ'লেই নারীর জীবনের সম্পূর্ণতা হয় না, নারীর যে ব্যক্তিত্ব আছে, তার যে স্বাতন্ত্র্য আছে, একথা আজ নারী নানা প্রকারে প্রতিপন্ন ক'র্‌ছে। আমাদের দেশে সে সুযোগ কম, তবুও ভগবান যখন বজ্র দিয়ে আঘাত করেছেন, তখন নির্ভয়ে আমি নারীর দাবীর বাণী নিয়ে কাজ ক'র্‌তে চাই।"

সত্যব্রত সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া নমিতার পায়েব ধূলি নিল, পরে ভাবগদগদস্বরে বলিল, "তাই হ'ক দিদি, তোমার 'পরে যে ভালবাসা ছিল, সে ভালবাসা যেন নিম্নগামী হয়ে তোমাকে বিকল না করে। আজ হ'তে তাই তুমি আমার দিদি; তুমি তোমার নিজের পথেই চল, আমার মনের চাপ দিয়ে তোমায় দুর্ব্বল ক'র্‌তে চাই নে।"

নমিতা বলিল, "সেই ভাল ভাই! তোমাকে ত আমি ভাই ব'লে গ্রহণ করেছি। প্রতি নারীর মাঝে হয়ত যে কুহক বিধাতা দিয়েছেন, সেই কুহক তোমায় ভ্রান্ত করেছিল, কিন্তু লোভকে জয় ক'রেই মানুষের পৌরুষ, সেই পৌরুষ-প্রতিযোগিতায় তুমি বিজয়ী হয়েছ, এর চেয়ে পরমানন্দের বিষয় তোমার দিদির আর কিছুই নেই। আশীর্ব্বাদ করি ভাই, তোমার জীবন পুণ্য ও ধন্য হয়ে উঠুক।"

সত্যব্রত কথা কহিল না, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ নীল সাগরে পাড়ি দিয়া বহিয়া যায়। সমস্ত ধরণী মুগ্ধচিত্তে আলোর প্লাবনে মগ্ন রহে।

সত্যব্রতের মনে নানাভাব তোলপাড় করিতেছিল। আশ্রিতা নারীর নিকট সে প্রণয় যাচ্ঞা করিয়াছিল। সমাজ-নীতি ও রীতির বিরুদ্ধে এই আহ্বান কতখানি অন্যায় ছিল, মোহের আবেগে সত্যব্রত তাহা বুঝিতে পারে নাই। নমিতার কার্য্যকলাপে সত্যব্রত আত্মস্থ হইয়া অনুশোচনায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল, নমিতার রূপ, সৌন্দর্য্য ও ব্যবহার পতঙ্গের মত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। অনুকম্পা হয়ত তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। কিন্তু সত্যকার প্রেম ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সত্যব্রত সন্দিহান হইয়া উঠিল। তাই সত্যব্রত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, “দিদি, আমি বর্ব্বর পশু, জীবনের যে অভিজ্ঞতা মানুষকে দক্ষ ও পটু ক’রে তোলে, তা আমার নেই। আমি তোমার মনে যে ব্যথা দিয়েছি, তা তুমি মনে রেখ না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।”

নমিতা বলিল, “রাত হয়েছে ভাই! এসব অকারণ ক্ষোভে তুমি কাতর হয়ো না। তুমি হৃষ্ট মনেই বাড়ী ফিরে যাও, তোমার দিদি কখনই তোমার প্রতি রুষ্ট হবে না। মানুষ জীবনে পদে পদে ভুল করে। সে ভুলকে স্বীকার ক’রতে সাহস কম লোকেরই আছে। ভুল করা তত দোষের নয়; যত ভুল স্বীকার না করা—দিদির এই কথাটী মনে ক’রে পথ চলিও, তাহ’লে দেখ্‌বে কোন কাঁটাই কোনদিন পায়ে ফুটবে না।”

১২

পরের দিন সকালে সত্যব্রত পরিতৃপ্ত সুষুপ্তির শেষে পৃথিবীর পানে চাহিয়া দেখিল। শীতঋতুর প্রভাতেও রবির সোণার কিরণে জগৎ ভাসিয়া যাইতেছে। সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে সে উঠিয়া বহুদিনের পঠিত কল্যাণ-মন্ত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল :—

"সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ,
সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু,
মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ।"

সত্যব্রত স্তোত্র পড়িয়া চলিল। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, দেবতা, মানব সকলের কল্যাণ কামনা করিয়া, এই মন্ত্র মানুষকে দ্বেষ ও হিংসার নরক হইতে মৈত্রী ও প্রীতির স্বর্গলোকে উত্তোলন করে। শ্লোক-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রতের মনে আনন্দধারা বহিতে লাগিল। সত্যব্রত স্থিরচিত্ত হইয়া নিজের কথা ভাবিতে বসিল। নমিতার সহিত পরিচয় তাহার জীবনের যাত্রাপথে গভীর সাড়া দিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যে খেলাকে আমরা জীবন নামে অভিহিত করি, সুলিখিত নাটকের মত সে কি কোনও পরিণতির দিকে বহিয়া চলিয়াছে, না কেবল সঙ্গতিহীন এক অনির্দ্দেশ যাত্রায় গতিচঞ্চল রহিয়াছে? যুগে যুগে মানুষ নানারূপ ইহার ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই স্থির হইয়া রহে না। মানুষের চলার সাথে মানুষের মনোভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া যায়। মানুষ নূতন দিক্ দিয়া দেখিতে চায়।

জীবনের চলস্রোত

নদীর বুকে নিত্যচঞ্চল ঊর্ম্মির মত জীবনের পটে কত বৈচিত্র্য, কত লীলা নিত্যদিন ঘটিয়া যায়। বাহির হইতে দেখিলে এই সমারোহ, এই প্রাচুর্য্য ও বিলাস মনোহরণ করে। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার পিছনে সত্যই কি কোন ঐক্যসূত্র আছে? চার্ব্বাকের সুরে সুরে মানুষ বহুবার বলিতে চাহিয়াছে, না, এটা শুধু ক্ষণিকের ক্ষণ স্বপ্ন।

কিন্তু তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট নহে। বারে বারে তাই নূতন সমাধান লইয়া নূতন রথী দেখা দেয়। ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, মানুষের সমস্ত প্রেরণার মাঝে, সমস্ত গতি ও সমস্ত স্পন্দনের মাঝে তাহার যৌনবোধ কাজ করিয়া চলিয়াছে। যৌনশক্তির এই আবেদন সাহিত্যের, শিল্পের ও সঙ্গীতের উপাদান যোগায়।

সমস্ত জগৎ ধরিয়া এই সৃষ্টিশক্তির কাজ চলিতেছে। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেও সন্তানের মধ্য দিয়া অমরত্ব-লাভের প্রচেষ্টা সুস্পষ্টভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

সত্যব্রত ভাবিতেছিল—এই বাঁচিয়া থাকাটাই কি চরম কথা? মানুষের বড় বড় কল্পনা, বড় বড় আশা, বড় বড় চিন্তা, সকলই কি মূলতঃ যৌন-লালসার ভিত্তিভূমি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে? নমিতার সহিত তাহার পরিচয় ও তাহার পরের ঘটনাবলী লইয়া সে যতই চিত্ত বিশ্লেষণ করিতে লাগিল, ততই নানা কূটতর্কের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। চিন্তার লহরী জাগে ও পুনরায় ডুবিয়া যায়।

এমন সময়ে যোগেশ আসিয়া প্রবেশ করিল। চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কি হে আর যে দেখা সাক্ষাৎ নেই? এমন ডুমুর ফুল হয়ে উঠলে কেন? পরে সত্যব্রতের নগ্ন-গাত্রের দিকে

তাকাইয়া বলিল, "তারপর ব্যাপার কি? এমন অসভ্যের মত খালি গায়ে বসে' আছ যে!"

সত্যব্রত কলহ করিবে না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাই শান্ত স্বরে উত্তর দিল, "আমি ত ভাই সাহেব নই, বাঙালীর ছেলে। বাংলাদেশে থাকি। পিতৃপিতামহ চিরকাল খালি গায়ে থেকে গেছেন। তাতে ত তাঁরা অসভ্য হয়ে যান নি!"

"না বাপু, তোমার ওসব স্বদেশী বক্তৃতা শুন্‌বার আমার অবসর নেই।"

সত্যব্রত বলিল, "স্বদেশী বা বিদেশী নয়, সত্য সব সময়ে সত্য। নগ্ন-গাত্র বাঙালীর ঘরে বড় বড় মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। আজ বিদেশের জীবনযাত্রার অনুকরণ কর্‌তে যেয়ে আমরা কেন অনর্থক দেশের চালচলনকে জটিল ক'রে তুলব?"

যোগেশ বলিল, "আমি তর্ক কর্‌তে চাই নে। কিন্তু এই শীতের দিনে খালি গায়ে থেকে শেষে অসুখ বাধাবে!"

সত্যব্রত বলিল, "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও, তাই সয়। কোটের বহর যতই বাড়াও, শীতের বহর ততই বাড়বে।"

"যাক্ ভাই, তোরা তর্কবাগীশ। তোদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কিছুতেই পারবো না। জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু কাল বল্‌ছিলেন, তোর কাছে এসে যেন নিমন্ত্রণ ঝালাই ক'রে যাই।"

"কেন?"

"জ্যোতিঃপ্রসাদবাবুর মনের ইচ্ছে, তুমি জন্মোৎসবে যাও।"

সত্যব্রত বলিল, "যাব ত ভেবেছি। কিন্তু আমি গিয়ে উপদ্রব না হয়ে বসি। এই ভয়ে মন বেশী এগোয় না।"

যোগেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কোন সঙ্কোচের কারণ নেই। ওদের মত সহৃদয়তা খুব কম পরিবারেই দেখতে পাবে। যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে। জ্যোতিবাবুর পাণ্ডিত্যের ও বিদ্যাবত্তার শেষ নেই। রাত দিন বইয়ের মধ্যেই ডুবে আছেন। তার জন্যে একটুও দেমাক নেই। অথচ বইয়ের পোকা নন্। সংসার যে চল্‌ছে, সে কথা ঠিক মেনে চলেন। আর ইন্দিরা, তার ত কথাই নেই। তার কথায় কথায় সুরের ফুলঝুরি ঝরে পড়ে। রূপে গুণে এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার চোখে পড়ে নি।"

সত্যব্রত কৌতুক করিবার জন্য বলিল, "কিন্তু ভাই, তা ভেবে এখন আর কি হবে! বৌদি নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠের কমলাকে সতীন কর্‌তে চাইবেন না।"

"তা চাইবে না ঠিক, কিন্তু সুন্দরকে আর যে কেউ অশ্রদ্ধা করুক, আমরা অশ্রদ্ধা ক'র্‌তে পারি না। জীবনের একটানা, একঘেয়ে স্রোতে সৌন্দর্য্যই যে শুধু শান্তির শতদল ফুটিয়ে তোলে। রূপের পূজারী হয়ে এ কথাও আমি ভুলতে পারি নে। তাই যা কিছু সুন্দর, তাইত আমাদের পূজার পাত্র। সুন্দরকে শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য দিতে তাই ত আমরা মোটেই কাতর নই ভাই!"

সত্যব্রত যোগেশের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইল। আমাদের দেশে সুন্দরের পূজা হয় না। নিত্যকার জীবনে সুন্দরের কোন স্থানই নাই বলিলে চলে। কোনও প্রকারে দিনগত পাপক্ষয় হইলে আমরা বর্ত্তিয়া যাই। আমরা তাই কখনও আবেষ্টন ও পরিবেশকে সুষীম ও মঞ্জু করিতে চাই না। খানিক পরে হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু ভাই সুন্দরকে ভালবাসা আর সুন্দরীকে ভালবাসা এক নয়, একথা ভুল্‌লে চ'ল্‌বে কেন?"

যোগেশ ভাবিয়া পাইল না, সত্যব্রত তাহাকে লইয়া কৌতুক করিতেছে, না আন্তরিক সত্য বলিতেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সত্যব্রতের মুখের উপর চোখ বুলাইয়া লইল। তাহার প্রশস্ত ললাটে, দীপ্তিময় চক্ষুদ্বয়ে, কোনও ইঙ্গিতের আভাস না পাইয়া সে আশ্বস্ত হইল। পরে বলিল, "আমাদের দেশের লোকের কুৎসাপ্রিয় জিহ্বা ভাল কাজকে মন্দ ক'রে তোলে ব'লেই কি আমরা ন্যায়ের পথ হতে বিচলিত হবো? কোনও তরুণীকে বন্ধু হিসেবে ভালবাসলে কোনই দোষ নেই। তুমি যে তরুণী বধূকে আশ্রয় দিয়ে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ, কম লোকেই তার মাহাত্ম্য অনুভব ক'রতে পারবে।"

যোগেশের কথা সত্যব্রতের হৃদয়ে গভীর আঘাত করিল। মহৎ কাজ করিতেছে ভাবিয়া সে নমিতাকে আশ্রয় দিয়াছে। সরল বিশ্বাসেই তরুণী তাহার আশ্রয় লইয়াছিল। সে আশ্রয়কে সে আপন লালসা দিয়া কলুষময় করিয়া তুলিতে গিয়াছিল। একথা মনে পড়িয়া আত্মগ্লানিতে ও অনুশোচনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল।

যোগেশকে তাই বাক্যবাণে অনর্থক জর্জ্জরিত না করিয়া, কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "ভাই, কিছু খাবার আনিয়ে দিই?"

যোগেশ বলিল, "তাতে আর আপত্তি কি! তবে একবার খেয়ে বেরিয়েছি। তাহ'লেও তুমি যখন ব'লছ, তখন অধিকন্তু নঃ দোষায়।"

সত্যব্রত চাকরকে ডাকিয়া খাবার আনিতে বলিল।

যোগেশ বলিল, "লক্ষ্মীছাড়া তোর ঘরে খেয়েও ত আরাম হবে না!"

সত্যব্রত বলিল, "তার আর উপায় কি!"

খাবার আসিল। আহারের মধ্যেই হৃদ্যতা সুনিবিড় হয়। খাইতে বসিলেই মানুষের মেজাজ দিল্‌দরিয়া হইয়া উঠে। যোগেশ একটি রাজভোগ গলাধঃকরণ করিয়া, অপরটী হাতে ধরিয়া বলিল, "ইন্দিরার জন্মোৎসবের এই বিপুল আয়োজন নিরর্থক নয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের মত এই উৎসবে ইন্দিরা দেবীর ভাগ্যনির্ণয় হবে!"

সত্যব্রত বলিল, "কেন, শুন্‌তে পাই শীতাংশুর সঙ্গেই না কি সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"ঠিক হয়ে গেছে তা নয়, তবে এ সম্বন্ধের উপর জ্যোতিবাবুর বেশ নজর ছিল।"

"তা হ'লেই ত হ'ল। শীতাংশু ত বেশ দরের ছেলে। যে কোন মেয়েই তাকে স্বামী পেলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবে।"

আচমন শেষ করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে যোগেশ উত্তর দিল, "সে কথা সব সময়ে খাটে না। কবিরা প্রেমকে অন্ধ বলেছেন, তাত' জানই। প্রাপ্তবয়স্কা ইন্দিরার নিজের ত একটা মত আছে।"

"কিন্তু যা শুনি, ইন্দিরারও ত এ বিয়েতে বিশেষ অমত নেই।"

"তরুণীদের মতামতের কথা কি বলা চলে ভাই; তারা কি যে চায়, তা তারা নিজেরাই জানে না। আজ বেলা হয়ে গেল। এখন উঠি। কিন্তু তোমার অবশ্য অবশ্য যাওয়া চাই।"

যোগেশ নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। সত্যব্রত প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

সত্যব্রত যখন শুনিল, ইন্দিরার জন্মোৎসব শুধু উৎসবের আয়োজন নয়, তাহার ভিতর প্রেমের ফাঁদ পাতা রহিয়াছে, তখন মনে করিল সে যাইবে

না। কিন্তু যৌবনে মানুষের মনে কৌতূহল বিপুল। সে কৌতূহল বলে, না গেলে ভাল দেখাইবে না। মানসিক দ্বন্দ্বে কৌতূহলই জয়ী হইল। খেলা করিতে আনন্দ আছে, দেখিতেও আনন্দ আছে। সত্যব্রত ভাবিল, সে শুধু খেলা দেখিবে। নির্লিপ্ত দর্শকের মত সে শুধু খেলা দেখিবে। খেলায় কখনও যোগ দিবে না। বিধাতাপুরুষ তাহার সঙ্কল্প শুনিয়া অলক্ষ্যে হাসিয়া লইলেন।

১৩

ইন্দিরার জন্মোৎসব।

সমারোহ ও বৈভবের আয়োজন যথেষ্ট হইয়াছে। যোগেশ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সমস্ত গৃহকে সুষমাময় করিয়া তুলিয়াছে। পুষ্প ও লতার তোরণ রচনা করিয়া, তাহাতে নানা দেশের মনোমোহন ছবি ঝুলাইয়া, গৃহের কান্তি ও সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুষ্পোদ্যানের মাঝে নারিকেল তরুর নিম্নে বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখানে অতি প্রত্যূষে বৈদিক যজ্ঞ করা হইল। দাক্ষিণাত্য হইতে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞের ব্যবস্থা হইল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। উদাত্ত স্বরে যখন ব্রাহ্মণ ঋকৃমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন, তখন মনে হইতেছিল, যেন বর্ত্তমান অতীত যুগের মাঝে ফিরিয়া গিয়াছে।

যজ্ঞশেষে জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু কন্যার সুন্দর ললাটে হোমভস্মরেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা, আজ তুমি

প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছ। তোমার ভাবী জীবন মহান্ হোক্, এই আমার একান্ত কামনা। ভারতবর্ষের নারী প্রাচীনকালে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীর্ত্তি রেখে গেছেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তুমিও তোমার জীবনকে সার্থক ক'রে তোল মা। ভারতবর্ষের ত্যাগ ও সংযমের বাণী তোমার জীবনের পাথেয় হোক্। কুমারী থাক কিংবা বিবাহ কর, একথা কখনও ভুলো না, তুমি ভারতবর্ষের নারী। জগতের মানুষ আজ বেদনাবিহ্বল হয়ে উঠেছে। সেই বেদনা দূর ক'রতে হ'লে আমাদের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার জীবনে আধুনিকতাকে অতীতের মাহাত্ম্যে পূর্ণ ও সম্পন্ন ক'রে তোল।"

চন্দনতিলকরঞ্জিতা ক্ষৌমবাসপরিহিতা ইন্দিরা নত হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, উপস্থিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলকে নমস্কার করিল। প্রভাত-সূর্য্যের রক্ত-আলো রক্তকমলের মত তাহার গৌর মুখমণ্ডলের উপর পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছিল। মনে হইতেছিল, ইন্দিরা যেন স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেবী।

সত্যব্রত জন্মোৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিল। তরুণের দলের অপর কেহ বৈদিক যজ্ঞের ব্যাপারটিকে বিশেষ খেয়াল করে নাই। কিন্তু সত্যব্রতের নিকট উৎসবের এই অঙ্গটি অতিশয় মধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল। যজ্ঞতিলকমণ্ডিতা ইন্দিরা যখন আবেশমুগ্ধ স্নিগ্ধ নয়ন দুটি মেলিয়া চারিদিকে দেখিবার জন্য চাহিল, তখন সত্যব্রতের বিস্ময়োজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি সে অনুভব করিল।

সত্যব্রতের সহিত ইন্দিরার পরিচয় ছিল না। তাই এই অপরিচিত যুবকের ভাবমধুর দৃষ্টি তাহার ভাল লাগিল না। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও সে

যেন দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। অপরিচিতের দৃষ্টি যেন ইন্দিরার চোখে যাদু ভরিয়া দিল। সত্যব্রতও নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সত্যব্রতও অনুভব করিল, সে যেন শ্যামা ধরণীর প্রথম মানব। সমুদ্রের বীচিবিক্ষোভিত বালুতীরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে, সে যেন প্রথম নারীকে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীরূপে দেখিতে পাইল। তাহার চোখের বিদ্যুৎ-চাহনি ভুলিয়াও যেন ভোলা যায় না। সত্যব্রত নমিতার নিকট প্রণয়-নিবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়া মনে করিয়াছিল যে, সে জীবনে নারীকে আর প্রীতির চক্ষে দেখিবে না। প্রেমের ফাঁদে পা দিবে না। একক জীবন যাপন করিয়া সেবা ও ত্যাগের মাঝে ডুবিয়া রহিবে। কিন্তু ইহা যে কত বড় মিথ্যা সঙ্কল্প, ইন্দিরার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তাহা সে অনুভব করিল। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ গৌরী ইন্দিরার লাবণ্যের মধ্যে যে আকর্ষণ ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। নমিতা সত্যব্রতের জীবনে যে কামনার অগ্নি জ্বালাইয়াছে, যে যৌনবোধের সঞ্চার জাগাইয়াছে, তাহা নিভিবার নহে। ত্যাগের যে সঙ্কল্প সে করিয়াছিল, তাহা কোন তপস্যার দ্বারা বলীয়ান্ নহে। তাই নারীর মধ্যে মোহ আছে, তাহা তাহাকে প্রলুব্ধ করে।

সত্যব্রত চিরকাল সুবোধ শিশুর মত জীবন যাপন করিয়াছে। কল্পনার রথে চড়িয়া সে বহুবার ধরণীকে স্বর্গ করিবার বাসনায় মনের নানা মহলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তাই অন্তরের মধ্যে যে কামনা আপনাকে নানা উৎসধারায় প্রকাশ চাহিয়াছে, তাহাকে সে অনুভব করে নাই।

মানুষের কাব্য মানুষের কামনাকে প্রেমের নামে মায়িক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ প্রেম স্বর্গীয় কোন সুধা নয়। বংশ-

বিস্তারের যে কামনা-পুষ্পকে গন্ধমধুর ও বর্ণরঙ্গিল করিয়াছে, পশুর ও পাখীর বিচিত্র সজ্জারচনা করিয়াছে, মানুষের মধ্যেও সেই আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাহার সমস্ত রক্তের মধ্যে উদ্দাম নৃত্য করিয়াছে।

প্রথম দৃষ্টিতে তাই মানুষ প্রেমে পড়িয়াছে বলিলে, ভুল বলা হয়। কামনার উচ্ছল বন্যা থামিয়া প্রেমের শান্ত মাধুরী পরে সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ রূপজ মোহ ও যৌন ক্ষুধাই নর ও নারীকে মোহের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরাইয়া ফেরে। যৌন লালসা মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ করিয়া চলে। তাহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত গতি এই যৌন সংস্কারের আবেশে আবিষ্ট।

ইন্দিরার যৌবনললিত সুঠামদেহ, বিকচকান্তি এবং সর্ব্বোপরি অপূর্ব্ব লাবণ্য সত্যব্রতের মনের গোপন তলে যে কামনা আছে, তাহা জাগাইয়া তুলিল। মানুষ ভুল করিয়া এই কামনাকে প্রেম বলে। পুঁথিপড়া বুদ্ধি হইতে সত্যব্রত মনে করিল, ইন্দিরার প্রতি মোহের এই ক্ষণিক প্লাবন সত্যই তাহার মনে প্রেমের আবির্ভাব করাইয়াছে। যোগেশের কথা তাহার মনে পড়িল। এই অপূর্ব্ব রূপসীকে জয় করিবার জন্যে হয়ত সংগ্রাম করিতে হইবে, তথাপি সে সংগ্রামে আনন্দ ও উল্লাস আছে। নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রির শেষে উঠিয়া, মানুষ যেমন পূর্ব্বাকাশে শুক্রতারার আবির্ভাব দেখিয়া বিস্ময় ও পুলকে পুলকিত হয়, সত্যব্রতও তেমনি এক অজানা শিহরণে কাঁপিতে লাগিল।

জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু ভিড়ের মধ্যে সত্যব্রতকে দেখিয়া বলিলেন, "এসেছ বাবা, বড়ই খুসী হলেম। প্রাচীনকালের মৃত অনুষ্ঠানকে বর্ত্তমানে জীবনের সাথে মিলাবার জন্যে এই আয়োজন করেছি। কিন্তু

কেউ এর মাহাত্ম্য বুঝ্‌ল না। তুমি এসেছ দেখে তাই বড়ই খুসী হয়েছি। কেমন লাগ্‌ল?"

আনন্দগদগদ কণ্ঠে সত্যব্রত কহিল, "সত্যিই কাকাবাবু, মনে হচ্ছিল যেন, বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত কলকোলাহল, সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলে' আমরা অতীতের স্নিগ্ধ তপোবনচ্ছায়ে ফিরে গিয়েছি।"

"ঠিক বলেছ বাবা! আমি ঠিক ঐটেই চেয়েছি। এই যন্ত্রের যুগে আমরা অতীতের নিবিড় শান্তিকে ভুলেছি। তাই অতীত অনুষ্ঠানকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে হবে।"

সত্যব্রত উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলিল, "বেদের যুগ আর ধর্ম্ম আমাদের জীবনের কোথাও ছাপ রাখেনি। লোকে তাই এই অনুষ্ঠানের মর্ম্ম বুঝ্‌বে না।" পুলকিত হইয়া জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু বলিলেন, "বাবা, আজকালকার ছেলেরা শুধু ইউরোপের দিকে মুখ ক'রে চেয়ে রয়েছে। ইউরোপের যা ভাল, তাকে গ্রহণ ক'র্‌তে আমি কখনও অমত করি নি। কিন্তু সেখান থেকে মত ও পথ আস্‌বে, আর আমরা তার অনুকরণ ক'রেই দিন যাপন ক'র্‌ব, এটা উচিত নয়। আমরা যদি বাঁচ্‌তে চাই, আমাদের নিজের বিশিষ্টতার উপর দাঁড়াতে হবে, অনুকরণের উপর নয়।"

বক্তৃতা হয় ত আরও চলিত, কিন্তু ইন্দিরা বলিল, "বাবা, চল এখন ঘরে ফিরি। সকাল থেকে ত কিছু খাওয়া হয় নি।"

কন্যার কথায় জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু পুরাতত্ত্বের কল্পলোক হইতে বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিলেন। পরে সত্যব্রতকে দেখাইয়া বলিলেন, "মা, এই সত্যব্রত, আমার বাল্যবন্ধু দেবব্রতের ছেলে। নমস্কার কর।"

শিরীষপেলব করযুগল জুড়িয়া ইন্দিরা সত্যব্রতকে নমস্কার করিল। স্মিতহাস্যে বলিল, "আপনি কখন এলেন ?"

সে কথা বীণাধ্বনির মত সত্যব্রতের অন্তরে গিয়া বাজিল। সত্যব্রত বলিল, "যজ্ঞ দেখ্‌বার জন্য ভোরেই এসেছি।"

ইন্দিরা চলিতে চলিতে বলিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি এসেছেন, বড়ই ভাল হয়েছে। বাবা তবু একজনকেও পেলেন, যিনি এই কাজটীর ভিতরের কথা বোঝেন।"

সত্যব্রত উত্তর দিল না। শুধু মুগ্ধচিত্তে ইন্দিরার গতিসুন্দর মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। ইন্দিরার শাড়ী হইতে সুরভি এসেন্সের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই সুরভি সত্যব্রতকে যেন প্রেমের নন্দনে পারিজাত বনের মধ্যে নিয়া গেল।

১৪

কয়েকদিবসব্যাপী উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। বিকালে হলঘরে নিমন্ত্রিত সকলের মজ্‌লিশ বসিল। চায়ের নামে যে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে যেসব দেশী ও বিলাতী নানাপ্রকার খাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ বর্ণনা করিয়া পাঠকের লালসা উদ্রেক করিয়া লাভ নাই।

বন্ধুরা যে সব উপহার দিয়াছিল, হলঘরের পাশেই একটী টেবিলে তাহা সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। শাড়ী, জামা, গহনা, নানা ফ্যাশানের আসিয়াছিল। কেহ কেহ পুস্তক ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি

দিয়া পালা রক্ষা করিয়াছে। যোগেশের মৎস্যকন্যার ছবি সকলের মনোরঞ্জন করিল। আধুনিক আর্টের রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে আঁকা হইলেও তাহাতে কোনই ধোঁয়া ছিল না। বাস্তবতার একটী আবেশ, সমস্ত কল্পনাটিকে বিকচ ও মোহন করিয়া তুলিয়াছিল। শ্যামলা বনানী রুদ্রের বিষাণ শুনিতে শুনিতে যেন অজ্ঞাতে ঘুমাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বনস্পতির বৃহৎশাখার ছায়ে গুল্ম ও লতার অবাধ রাজত্ব, বেশ ভাল ভাবেই ফুটানো হইয়াছে। উদ্দামতরঙ্গমুখর নদীর গতি শিল্পী বেশ কৃতিত্বের সহিত আঁকিয়াছিল। দেখিলেই মনে হয় সত্যকার নদী। তাহাতে কল্পনা-লোকের সুন্দরী মৎস্যকন্যারা ডুবিয়া মরিতেছে। সকলেই একবাক্যে ছবিটীর প্রশংসা করিল। মৎস্যকন্যার নায়িকার মূর্ত্তিতে ইন্দিরার মুখচ্ছবিও সকলের খুব ভাল লাগিল।

সত্যব্রত রাজপুতানা ভ্রমণকালে একটী প্রাচীন ছবি পাইয়াছিল। সেই ছবিটী জন্মতিথির উপহাররূপে পাঠাইয়াছিল। ছবিখানির নাম উমার তপস্যা। কল্পনা-চাতুর্য্য, ভাবগম্ভীরতায়, অঙ্কন-নিপুণতায়, ছবিখানি প্রাচীন শিল্পকলার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুসুমায়ুধ মদন রুদ্রের রোষ-লোচনে পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছেন, তথাপি গৌরী নিবৃত্ত নন। যে গভীর আন্তরিকতায় উমা গিরীশের চিত্তজয় করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত, তাহার সজীব স্পর্শে ছবিখানি যেন হাসিতেছে, গৌরীর তপস্যার নিকেতন গৌরীশৃঙ্গ আজিও উচ্চশীর্ষ উন্নত করিয়া তপস্যা ও সংযমের বাণী জগতে প্রচার করিতেছে। সেই গৌরীশিখরের উপর বল্কলজটাধারিণী তাপসী উমা। তপস্বিনীর কৃচ্ছ্রসাধনে দেবাদিদেবের আসন টলিল। তিনি আসিলেন। ছলনায় ভুলাইয়া পরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। সেই

সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কবি কালিদাস লিখিয়াছেন :—

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি,
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী,
মার্গাচলব্যতিকরা কূলিতেব সিন্ধু.
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ।

তুলির লিখনে শিল্পী এই সুন্দর অবস্থাটি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

নিমন্ত্রিত অপর কেহই এ চিত্রে বিশেষ মনোযোগ দিল না। জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু যোগেশকে বলিলেন, "দেখছ, কি অনবদ্য আলেখ্য, আমাদের প্রাচীন শিল্পরীতি মধ্যে এমনই কত যে অক্ষয় সম্পৎ ছিল, আমরা তার আদর করি না, তার সম্মান করি না, র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জেলোর ছবির পাশে দাঁড়াতে পারে, এমন বহু ছবি আমাদের দেশে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

যোগেশ উত্তর দিল, "এ ছবির ভঙ্গী যদিও নব্য নয়, তবু এর মাঝে ভাবোচ্ছ্বাস আছে। কালিদাস তার উপমামধুর লেখার এক সর্গে যতখানি প্রকাশ ক'রতে পারেন নি, শিল্পীর রসিক মন এখানে তার চেয়ে বেশী দু'চার রেখাপাতেই করেছেন।"

সেখান হইতে সকলে টেনিসকোর্টে গেল। জ্যোতিঃপ্রসাদ তরুণ-তরুণীদের পূর্ণমাত্রায় আমোদ অনুভব ও গল্প-গুজব করিবার সুযোগ দিবার জন্য অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

পিছনে ময়দানে নূতন ক্ষেত্র তৈয়ার করা হইয়াছে। এক পাশে দর্শকদের জন্য চেয়ার সাজান রহিয়াছে। প্রথমবারে যোগেশ, শীতাংশু, রেখা ও ইন্দিরা খেলিতে আরম্ভ করিল। যোগেশ ও ইন্দিরা একদিকে,

শীতাংশু ও রেখা অন্যদিকে নামিল। সকলেই আশা করিয়াছিল, শীতাংশু ও ইন্দিরা একদিকে খেলিবে। কিন্তু খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রেখাকে সম্বোধন করিয়া শীতাংশু বলিল, "চলুন, আপনি আর আমি একদিকে।"

রেখা নম্রকুণ্ঠার সহিত উত্তর দিল, "আমি কি খেল্‌তে জানি? অনেক ভাল খেলোয়াড় আছেন—"

শীতাংশু তাহাকে আপত্তির অবকাশ না দিয়া বলিল, "না না, আপনার বিনয়ের প্রয়োজন নেই; যা জানেন, তাতেই চ'ল্‌বে।"

জন্মতিথির উৎসব হইতেই শীতাংশু রেখার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখাইতেছিল। শীতাংশুর এ ব্যবহার অনেকটা ইচ্ছাকৃত। পরস্পর কাণা-ঘুষায় সে শুনিয়াছিল, সত্যব্রতকে ইন্দিরার ভাবী বর হিসাবে নিমন্ত্রণ করা হইতেছে। ইহাতে সে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দিরার প্রতি তাহার আকর্ষণ ছিল, কিন্তু সে সর্ব্বদা ভাবিত, ইন্দিরার চেয়ে সে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ধনে, মানে, জ্ঞানে ইন্দিরার চেয়ে সে শতগুণে ভাল। তাই ইন্দিরার প্রতি আকর্ষণের পিছনে আপন শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান জড়িত ছিল। জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু শীতাংশুকে উপেক্ষা করিয়া সত্যব্রতের সহিত ইন্দিরার বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়াছেন, এই কথাটুকুই তাহার পক্ষে ভয়ানক অপমানজনক বলিয়া মনে হইল। ক্রোধে ও ক্ষোভে সে প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, সে জন্মতিথির উৎসবে যোগ দিবে না। পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল যে, উপেক্ষা দিয়া উপেক্ষাকে শোধ করিবে।

তাই উৎসবের প্রথম হইতেই সে রেখার সহিত প্রীতি ও সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে ব্যগ্র ছিল। রেখার সহিত পূর্ব্ব হইতেই শীতাংশুর

পরিচয়। শ্রীনাথ রায় শীতাংশুকে জামাতা করিবার জন্য চেষ্টিত ছিল, এজন্য মাঝে মাঝে দু' একটী পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু শীতাংশুর মন অন্যত্র জানিতে পারিয়া শ্রীনাথবাবু তাহার আশা ছাড়িয়া দেন।

রেখার রূপের গুমর করিবার মত কিছু ছিল না; যে জলুষ নয়ন-ধাঁধায়, সে জলুষ না থাকিলেও তাহার মধ্যে লজ্জা-মধুর একটী কমনীয়তা ছিল, যাহা সকলকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না।

শীতাংশু আজ অভিমানে রেখার পানে চাহিয়া অনুভব করিল, রেখাই জগতের মধ্যে সবার চেয়ে সুন্দরী। তাহাকে লাভ করিবার কামনা জাগিবামাত্র, শীতাংশু রেখার সমস্ত কার্য্যে ও কলাপে সুষমার আভাস দেখিতে পাইল। চঞ্চলা বাক্‌পটু সুলেখা, দীপশিখার মত শান্তোজ্জ্বলা রেখার চেয়ে দৃষ্টিপথে পড়ে, কিন্তু রেখা তাহার শান্ত চক্ষুর গভীর মোহ দিয়া প্রাণ কাড়িয়া লয়।

অভিমানের রুদ্ধস্রোত মুক্ত ধারার বেগে বহিয়া চলে। রেখাকে আদর করিয়া, বড় করিয়া শীতাংশু আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়। টেনিশ খেলা চলিল। শীতাংশু ভাল খেলিত, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ও তাহার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবার আনন্দে, রেখা খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। খেলা খুব জোরের সহিত চলিতে লাগিল।

সুব্রত, সত্যব্রত, বিজন প্রভৃতি একত্র বসিয়া খেলা দেখিতেছিল। ইন্দিরা একটা বল বিশেষ কায়দার সহিত আঘাত করায় সত্যব্রত বলিল, "A fine shot"। সুব্রত সত্যব্রতের প্রশংসা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "কিন্তু যা বল ভাই, এ সমস্ত বিবিয়ানা আমাদের ধাতে সইবে না।"

বিজন বলিল, "কেন? সে-কালের অভিজাতেরা মৃগয়া ক'রে, কুস্তী লড়ে' আমোদ পেতেন, এখনকার লোকে টেনিস খেলে পায়।"

সত্যব্রত বলিল, "তোমার স্বদেশিকতা বুঝি ভাই, কিন্তু কালের স্রোত রোধ করা চলে না, প্রতি বৎসরই টেনিসের আদর বেড়ে চলেছে। য়ুরোপের লোক একজন টেনিস-চ্যাম্পিয়ান্‌কে দিগ্বিজয়ী বীরের মতন মনে করে। ওদের বড় বড় মাসিক ও সাপ্তাহিকে টেনিস খেলার ছবি ভরে' উঠ্‌ছে। জগতের লোক যা চাইছে, আমরা কি তা উপেক্ষা কর্‌তে পারি!"

সুব্রত বলিল, "জগতের লোকের এই ব্যসন ও বিলাসের দিকে তোমাদের চোখ পড়ে, কিন্তু তাদের সদাজাগ্রত কৌতূহলের প্রতি তোমাদের লোভ নেই; ওরা যে প্রকৃতিকে জয় ক'রে, জগতের রূপ বদ্‌লে দিচ্ছে, সেদিকে অনুকরণের চেষ্টা নেই—"

সুব্রতের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে শীতাংশু এমন সুন্দর করিয়া একটী বল মারিল যে, দর্শকেরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "Splendid", কেহই আশা করে নাই যে, সে বল কেহ ফেরৎ পাঠাইতে পারে, কিন্তু ইন্দিরা ক্ষিপ্রতার সহিত এমন ভাবে সে বল ফেরৎ পাঠাইল যে, সকলেই অবাক হইয়া গেল। শীতাংশু সে বল আর ধরিতে পারিল না। ইন্দিরাই জয়ী হইয়া গেল।

রাত্রে ভোজনের শেষে সিনেমার আয়োজন হইল। ডগ্‌লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কসের প্রাচীন কীর্ত্তি "The thief of Baghdad" অভিনীত হইতেছিল। যখন ছবির মাঝখানে বিরামের সময় উপস্থিত হইল, তখন সুব্রত বলিল, "গল্পটী চমৎকার বটে, সাজসজ্জা উত্তম, কিন্তু এর চেয়ে শিক্ষাপ্রদ ফিল্ম্ আন্‌লে যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ হ'ত।"

বিজন চটিয়া উত্তর দিল, "তোমার বক্তৃতা এখন রাখ। সিনেমায় কেউ শিক্ষা নিতে আসে নি। রসের আনন্দলোক যেখানে মুক্ত হচ্ছে, সেখানে গুরুগিরি চালিও না। এই ছবির মধ্যে যে রোমান্স আছে, তার বিশেষ অনুভূতি একটা পরম আনন্দ।"

সুব্রত বলিল, "সে কথা মানি। কিন্তু জন্মতিথির এই আনন্দ-উৎসবে যদি গতানুগতিক ভাবেই চলি আর নূতন কিছু না করি, তাহ'লে এর সার্থকতা কোথায় ? এ ছবি ত লোকে ম্যাডানে গিয়ে দেখ্‌তে পারে। এখানে আমাদের এমন কিছু করা উচিত ছিল, যা আমাদের কৃষ্টির পরিচায়ক হ'ত..."

সত্যব্রত বলিল, "ভাই চুপ কর, যারা আয়োজন করেছে, তারা যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে। অনর্থক বাক্য ব্যয় ক'রে কেন জ্বালাতন কর্‌ছ ?"

সুব্রত রাগিয়া বলিল, "চুপ ক'রে ত থাক্‌তে পারি নে ভাই। সমাজকে সৎপথে নেবার গুরুব্রতই আমি নিয়েছি। তার রুচি পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে হ'লে চুপ ক'রে থাক্‌লে চ'ল্‌বে কেন ? যেটা ভাল, তাকে জোর গলায় প্রচার কর্‌তে হবে।"

বিজন তর্কের উত্তর দিতে যাইতেছিল। কিন্তু আলো নিবিয়া গেল। পুনরায় চলচ্চিত্রের চলা সুরু হইল।

১৫

পরের দিন গানের জল্‌সা হইল। নীরেশ নূতন নূতন সুরের উদ্ভাবন করিয়া কয়েকটা পুরাতন অতি পরিচিত গান শুনাইল। শ্রোতৃমণ্ডলী

বিস্ময়-মুগ্ধচিত্তে অনুভব করিল যে, কলাবিৎ কেমন করিয়া মরা মালঞ্চে ফুল ফুটায়, কেমন করিয়া মরা গাঙে জোয়ার বহায়। নীরেশের গানের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েরা গান গাহিল।

রেখা শীতাংশুর রচিত নূতন একটী গান গাহিল। নীরেশ সুর সংযোজনা করিয়াছিল। রেখা সেই সুরে অতি মধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া সবাইকে চমৎকৃত করিল, শীতাংশুর আনন্দ ও উৎসাহ আর ধরে না। ইন্দিরাকে ছোট করিয়া রেখার সম্মান বাড়াইবার জন্য সে সকলকে শুনাইয়া বলিল, "বাঃ! আপনি যে এমন চমৎকার গাইতে পারেন, তা ত জানতুম না, নীরেশ আপনাকে দেখিয়ে দিলে আপনি গানের মাঝে নিজস্ব একটী ছাপ দিতে পার্‌বেন"

রেখা লজ্জাকুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "না, আপনি আমায় বাড়িয়ে বল্‌ছেন!"

"মোটেই বাড়িয়ে বল্‌ছি নে। আপনার কণ্ঠে সাতটা সুরই সাতটী পোষা পাখীর মত খেলে। তার উপর আপনার মূর্চ্ছনা ও গিট্‌কারিও চমৎকার!"

শীতাংশুর এই ব্যবহার সত্যব্রতকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। সে ইন্দিরাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল, "এইবার আপনি কিছু গান।"

ইন্দিরা কহিল, "গান এখন জম্‌বে না। আমি এস্‌রাজ বাজাই।"

"বাজান, এস্‌রাজ আমি খুব ভালবাসি।"

সত্যব্রতের অনুরোধ ইন্দিরার অন্তরে সাড়া দিল। ধীরে ধীরে এস্‌রাজ টানিয়া লইয়া সে একটী বেদনাভরা রাগিণী বাজাইল। সমস্ত

ঘর বেদনায় যেন আর্ত্ত হইয়া উঠিল। সুরের রণন থামিয়া যায়। আবার স্বরগ্রাম বাহিয়া নাচিয়া ওঠে। স্তব্ধ-বিস্ময়ে সকলে শুনিতে লাগিল। বাজনার শেষে নীরেশ আবার গান গাহিয়া চলিল। সুলেখা ও সুলেখার সহপাঠী প্রীতি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী নূতন গান গাহিল। গান শেষ হইলে, সত্যব্রত বলিল, "আজকের জল্‌সা খুব চমৎকার হয়েছে। কিন্তু কুমারী ইন্দিরা যেমন মিষ্ট ক'রে এস্‌রাজ বাজিয়েছেন, এমন মধুর বাজনা আমি জীবনে কখনও শুনি নি।"

শীতাংশু বলিল, "এক জিনিষের সঙ্গে আর এক জিনিষের তুলনা হয় না, রেখা দেবী যে গান গেয়েছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট।" পরে রেখা দেবীর মুখে লজ্জার কুণ্ঠা দেখিয়া বলিল, "না না, আপনি লজ্জা ক'র্‌বেন না, শক্তির যথার্থ পূজা না হ'লে তার বিকাশ হয় না।"

ইন্দিরার সহিত শীতাংশুর পূর্ব্বপ্রীতির কথা স্মরণ করিয়া সত্যব্রত শীতাংশুর এই রূঢ়তার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না। এই প্রশংসার অন্যায় আঘাত তাহার সমস্ত মনকে তিক্ত করিয়া তুলিল। নীরেশ এই অপ্রিয় সমালোচনা থামাইয়া বলিল, "ওঁদের দু'জনেরই বেশ ভাল শিক্ষা আছে, সত্যিকার ওস্তাদের হাতে শিক্ষা পেলে ওঁদের গান চমৎকার হয়ে উঠ্‌বে।"

শীতাংশুর ইচ্ছাকৃত ভাষা ইন্দিরার বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরির মত বিঁধিল। অসম্ভব বলিয়া এ আঘাতের বেদনা বেশী বলিয়া মনে হইল। শীতাংশুর সহিত তাহার সম্বন্ধ সহজ বন্ধুত্বের মধ্যেই শেষ হয় নাই। পিতার ইচ্ছা জানিয়া তাহা বন্ধুত্বকে ছাড়াইতে চলিয়াছিল। ইন্দিরা ভাবিত, সত্যই

সে শীতাংশুকে ভালবাসে। কিন্তু এই ভালবাসাকে সে কোনও দিন যাচাই করিয়া দেখে নাই। কিন্তু আজ আঘাত পাইয়া তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে নিজের মন বিশ্লেষণ করিতে বসিল।

একটী গার্ডেন-পার্টিতে শীতাংশু ইন্দিরার সহিত পরিচিত হয়। তাহার পর শীতাংশু প্রতিবেশী জ্যোতিঃপ্রসাদ গুপ্তের সহিত আলাপ পরিচয় জমাইয়া লয়। মিঃ গুপ্ত শীতাংশুর সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে ইন্দিরার ভাবী বর করিবেন, এই আশা পোষণ করায়, তরুণ ও তরুণীর মধ্যে হৃদ্যতা বাড়িয়া চলে। কিন্তু এই নৈকট্য বাহির হইতে চাপান জিনিষ। ভিতরের সাড়া হইতে ইহা জাগে নাই। প্রণয়ের উত্তেজনা যে ইহাতে একেবারে ছিল না, তাহা নয়; কিন্তু অতি পরিচয়ে এই সৌখ্য যৌবনের রহস্যমধুর চাঞ্চল্যে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। বিরক্তি ও ঘৃণায় ইন্দিরা আত্মহারা হইয়া উঠিল। আত্মসংবরণ করিবার জন্য সে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে ম্যাজিক হইবে ব্যবস্থা ছিল; প্রদোষচ্ছায়ায় অভ্যাগতেরা এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শীতাংশু রেখাকে ডাকিয়া লইয়া বাগানে পায়চারী করিতে গেল। বেড়াইতে বেড়াইতে রেখা বলিল, "আপনি আমার গান ভাল বলেছেন ব'লে সইয়ের অমন দেমাক করা ঠিক হয় নি।" নারীর সহজাত ঈর্ষ্যা ও জিগীষা রেখার মনে জ্বালা ধরাইয়াছিল। তাই আপনার ইচ্ছার অজ্ঞাতেই সে বান্ধবীর বিরুদ্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

শীতাংশুর মন ভাল ছিল না, তাহার মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ইন্দিরার দিক্ হইতে আকর্ষণ বিশেষ না থাকিলেও তাহার দিক্ হইতে প্রীতি ছিল।

তাই ইন্দিরাকে আঘাত করিয়া সে স্বস্তি পাইতেছিল না। রেখার অভিমান তাই সে জ্বালায় ইন্ধন জোগাইল।

"রেখা, পরের কুৎসা ক'রে নিজেকে ছোট ক'রো না। ইন্দিরাকে আমি ভালবাসি। আমার ব্যবহার ভদ্র হয় নি।"

রেখা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। যেন উচ্চ পাহাড়ের শিখর হইতে অতল স্পর্শ সাগরজলে পড়িয়া গেল। একবার মনে হইল—শীতাংশুর কথা রুদ্ধ অভিমানের আক্ষেপ, কিন্তু আবার মন সন্দেহ দোলায় দুলিয়া ওঠে। কি করিয়া শীতাংশুর সে ক্ষোভ দূর করিবে, তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না।

শীতাংশু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া রেখার অপ্রতিভ মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আমায় মাপ করো, রেখা। আমার কোন দোষ নেই। আমি আজ অস্থির হয়ে উঠেছি।"

রেখা কুণ্ঠিতস্বরে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"তা ঠিক বুঝানো দায়, ইন্দিরাকে আমি মোটেই ভালবাস্‌তে পারি নি। পরিচয়ের নিবিড়তা থাক্‌লেই যে ভালবাসা হয়, তা নয়। স্বাধীনতার যত মন্ত্রই আওড়াই না কেন, আমার মনের উপর আদিম-যুগের স্বামিত্বের ভূত চেপেছিল। দিনের পর দিন আমি ইন্দিরাকে দখল ক'র্‌তে চেয়েছি, তার উপর আমার অধিকার কায়েম ক'র্‌তে চেয়েছি। তাই আজ বেদখল হওয়ার শঙ্কায় আমি উতলা।"

রেখা সমস্ত খবর সঠিক জানিত না। তাই বিস্ময়ে সে বলিল, "আপনি কি ভালবাসেন নি?"

শীতাংশু খানিক গম্ভীর হইয়া রহিল। কেয়ারীর গোলাপ গাছ হইতে

একটী রক্তগোলাপ তুলিয়া পাপ্‌ড়ীগুলি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে উত্তর দিল, "ভালবাসা যে আমার ছিল, তা আজ আর ব'লতে পারিনে। এতদিন ভান করেছি যে ভালবাসি, কিন্তু আসলে ভালবাসি নি। যে ভালবাসা শুধু অধিকার বজায় রাখ্‌তে চায়, সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়।" বিলাতি নভেলে এমনি বহু কথা রেখা পড়িয়াছে। কিন্তু কখনও ভাবে নাই, সত্যকার জীবনে প্রণয়ের এই কূটদ্বন্দ্ব কখনও জাগে। রেখা তাই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। সন্ধ্যার স্বর্ণদ্যুতি পুষ্প-বীথির উপর যেন যাদু বুলাইয়া যায়। অন্ধকার ও আলোর মাঝে লড়াই চলে। শীতাংশুর অন্তরেও যেন আলো-ছায়ার এমনি বিরোধ কাজ করিয়া চলে। খানিক পরে রেখার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "তুমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছ, রেখা।"

"অবাক্ নই, তবে আপনাকে ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। আপনি অনর্থক কেন অনুশোচনা ক'র্‌ছেন?"

"অনুশোচনা নয়, এ আমার অহঙ্কারের বেদনা। আমার নিজের মর্য্যাদার উপর অতি বিশ্বাসের ফলে জাগ্রত ঈর্ষ্যা। আমি ভেবে এসেছি যে, আমি সবার চেয়ে বড়, সবার চেয়ে যোগ্য।"

রেখা বাধা দিয়া বলিল, "আপনি নিজেকে খালি খালি ছোট ক'র্‌ছেন কেন? আপনার যোগ্যতা……"

শীতাংশু আক্রোশে উত্তর দিল, "রেখা, তোষামোদ ক'রো না, আমি আমার ক্ষুদ্রত্ব জানি। মিথ্যা অভিমানের উপর দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতি মুহূর্ত্তে বঞ্চনা করেছি। তাই ত আজ আমার দুঃখের অবধি নেই। আমার ছোট আমিকে নিয়ে এতদিন মুস্কিলে ছিলুম। আজ সমস্ত দোষের বোঝা নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে চাই।"

রেখা বলিল, "আঘাত পেয়ে আপনি বিচলিত হয়ে উঠেছেন। আত্মবিশ্বাসের উপর আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ান। সকলের শ্রদ্ধা আপনার পায়ের তলে এসে দাঁড়াবে।"

শীতাংশু ভাব-গদগদকণ্ঠে বলিল, "আজ তাই আমি আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি......"

কথা শেষ হইল না। সুলেখা আসিয়া বলিল, "চল দিদি, ম্যাজিক আরম্ভ হয়ে গেছে।"

চলিতে চলিতে রেখা বলিল, "আপনাকে আপনি বিশ্বাস করুন। তাহ'লে দুঃখের বদলে আনন্দ এসে দেখা দেবে।" বলিয়াই অন্ধকারেও রেখার মুখ যেন লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। কৌতূহল ও সন্দেহে শীতাংশু জিজ্ঞাসা করে, "সত্যাই ?"

রেখা ততক্ষণ ব্যস্ত সুলেখার সহিত আগাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার শুধু প্রতিধ্বনি দিয়া শীতাংশুর কথার উত্তর দেয়।

১৬

পরের দিন কবি-গানের আয়োজন হইয়াছিল। মিঃ গুপ্ত দেশীয় প্রাচীন গানের উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেন।

শীতাংশু প্রভৃতি নব্যেরা কেহই গান শুনিতে আসিল না, যোগেশও কি কারণে উপস্থিত ছিল না; কাজেই সত্যব্রত ইন্দিরার পাশে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

গান চলিতেছিল। একদল উত্তর চাহিয়াছে, "কালী কেন শিবের

বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন?" অপর দল আধ্যাত্মিকতার আবরণে তাহার উত্তর গাহিয়া চলিতেছিল।

ইন্দিরা প্রশ্ন করিল, "গান আপনার কেমন লাগ্‌ছে?" সত্যব্রত বলিল, "আমি গান বুঝি, একথা ব'ল্‌তে পারি না। কিন্তু অবাক্ হয়ে ভাবছি, এই সমস্ত অশিক্ষিত লোকেরা কেমন ক'রে আমাদের দেশের দর্শনের গভীর তত্ত্বগুলি নিয়ে সহজ সুরেই গান বাঁধছে।"

ইন্দিরা বলিল, "বাবা বলেন, এই গানের মধ্য দিয়েই লোকের মনে আমাদের সাধনার প্রচার হয়েছে। লোক-সাধারণের শিক্ষা নিয়ে আজকাল মহা আড়ম্বর চলেছে। ক-খ-গ শিখাতে পার্‌লেই মনে করি যে মানুষের বুদ্ধি ঋদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু প্রাচীন কৃষ্টি চাইত মানুষের মনে সত্য ও ঋতের বার্ত্তা গভীর ক'রে প্রোথিত ক'রে দিতে। তাই ত কথকতা, পুরাণ পাঠ, জারি, ভাসান, তর্‌জা, কবি ও যাত্রাগান আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের গুরুর কাজ করেছে!"

সত্যব্রত উত্তর দিল, "সে কথা সত্য, আমাদের প্রাচীন জীবনযাত্রার মাধুরী আজ আর নেই। সমগ্র জাতির অংশের ও সমষ্টির মধ্যে একটা বিরাট্ যোগ ছিল। এই সমস্ত লোকপ্রচলিত গান ও কৌতুক সকলের মধ্যে প্রীতির ও ভাবনার মিলন-সূত্র গেঁথে রাখ্‌ত। আজ সে যোগ-সূত্র ছিঁড়ে যাচ্ছে, তাই ত চারিদিকে একটা অরুন্তুদ বেদনার দাবদাহ জ্বল্‌ছে।"

ইন্দিরা বিস্ময়ে বক্তার ভাবোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সমস্ত বন্ধুবান্ধবের কাছে এই সমস্ত ভাবুকতার স্থান ছিল না। পিতার নিকট হইতে প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ সে পাইয়াছিল, কিন্তু

বর্ত্তমানের কোনও মানুষ আর অতীতের পানে লুব্ধদৃষ্টি মেলে না; তাই সহসা সত্যব্রতের মাঝে সমদরদী একজনকে পাইয়া সে উল্লসিত হইয়া উঠিল।

গান চলিতে লাগিল। একটী গানের পদে শঙ্করের মায়াবাদের কথা ছিল। ইন্দিরা সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সত্যব্রতকে বলিল, "দেখুন, আমাদের গেঁয়ো বৈরাগীরা কেমন সহজ ভাবে আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে হজম করেছে।"

"আমাদের জীবনে এই সহজ সাধনা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে। পশ্চিমের জীবনযাত্রা শুধু ভোগকে বাড়িয়ে চলেছে, আমরা তারই অনুকরণ ক'রে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই সারাদিন আকুল হয়ে ঘুরছি। তাই দিনে দিনে পাখীর কাকলীর মত সহজ ও সরল এই গানগুলি দিন দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

বক্তার আন্তরিকতা ইন্দিরার হৃদয় স্পর্শ করিল। সে কথোপকথনকে অগ্রসর করিবার জন্য উত্তর দিল, শীতাংশুবাবু বলেন, "যা ঝর্‌ছে তার জন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই। কালের সংগ্রামে যার প্রয়োজন নেই, সে আপনি হারিয়ে যায়। সেই জন্য আজ আমরা যেন অনুশোচনা না ক'রে পশ্চিমের সৃজনশক্তিকে অভিনন্দন ক'রে নূতন জিনিষ গড়্‌তে লেগে যাই।"

সত্যব্রত বলিল, "এ যুক্তি কি ঠিক? রোগী ম'র্‌তে বসেছে, তার জন্য তাহ'লে চিকিৎসার প্রয়োজন কোথায়? আমি মানি, যুগে যুগে যুগোপযোগী ভাব ও চিন্তা জাগে, যুগের শেষে তা বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু তাই ব'লে শাশ্বত যে জিনিষ, তাকে কি আমরা অবজ্ঞা ক'র্‌তে পারি?

বাল্মীকি যে রামায়ণ গেয়েছিলেন, মানুষ আজও তাকে দূর ক'রে দিতে পারে নি, তার কারণ তার মধ্যে অমৃত আনন্দের বার্ত্তা রয়েছে।"

ইন্দিরা বলিল, "এ কথা ন্যায্য ব'লে মনে হয়। কিন্তু শীতাংশুবাবু বলেন, মানুষ এগিয়ে চলেছে। অগ্রগতি তার যাত্রাপথের মন্ত্র। গুহায় একদিন মানুষ ছিল। কিন্তু সে গুহাকে চরম ব'লে জান্‌লেই মানুষের চ'ল্‌ত না। মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত বিবর্ত্তন চলেছে। তাই যারা সমুখ থেকে মুখ পিছনে দিয়েছে, তাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।"

সত্যব্রত উষ্ণ হইয়া বলিল, "আপনি শুধু পরের মতের প্রতিধ্বনি ক'র্‌ছেন। আপনার শিক্ষা-দীক্ষা শুনেছি যথেষ্ট। আপনাকে এ সব বলা হয় ত ধৃষ্টতা হবে। সত্যকে জান্‌তে হ'লে, নিজের অন্তর দিয়েই জান্‌তে হবে। অপরের কথার পুঁজি বহন ক'র্‌লে, সে সহায় না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।"

"আপনি চট্‌ছেন, কিন্তু অপরের কথাই বল্‌ছি। কারণ এ কথার নূতনত্ব ও অপূর্ব্বত্ব আমায় মুগ্ধ করে; ঠিক ক'রে না বুঝলেও, এ কথার চমৎকারিত্ব না মেনে পারি নে। তাই আপনার সঙ্গে আলোচনা কর্‌ছি।"

গায়কদের মধ্যে তখন ঝগড়া চলিয়াছে। এক দল অপরকে উপেক্ষা করিয়া একটী গান গাহিতেছিল, "ফুলের মধু ভ্রমর জানে, বোল্‌তা জানে না।"

সত্যব্রত গানের প্রতি ইন্দিরার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, "ঐ যে কবি বল্‌ছে ঠিক কথাই, অরসিক রসের খবর কিছুতেই জানে না। তরুণের উন্মত্ততাকে আমরা শক্তি ব'লে যেন ভুল না করি। জগতের বিবর্ত্তন ছন্দ ও তালের বিবর্ত্তন, সে খাপছাড়া বিদ্রোহ নয়—"

এমন সময়ে জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু আসিয়া বলিলেন, "মা! ভালই হ'ল, এই মাত্র কোম্পানীর চিঠি পেলাম। তাঁদের লঞ্চ "মে-কুইন" দু'দিনের জন্য পাওয়া যাবে, কাল দুপুরেই তোমরা তাহ'লে বের হতে পার।"

সত্যব্রত বলিল, "কোথায় যাওয়া স্থির হয়েছে?"

জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু বলিলেন—"ডায়মণ্ড হারবারের দিকে গিয়ে, কাকদ্বীপে কিংবা ঐ রকম কোথাও চড়ুই-ভাতি ক'রে ফিরতে পারা যাবে।"

সত্যব্রত বলিল, "কিন্তু কাল আমার যাওয়া হবে না দেখ্ছি, বাবা আস্ছেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কাজের কথাবার্ত্তা আছে।"

ইন্দিরা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইল, পরে বেদনাকাতর স্বরে বলিল, "চেষ্টা ক'রে দেখ্বেন। সবাই না গেলে আনন্দ হবে না।"

জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু কন্যার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "তাই ক'রো বাবা, তোমার বাবাকে আমার কথা ব'লো। তাহ'লে হয় ত অনুমতি দেবেন।"

সত্যব্রত বলিল, "চেষ্টা ক'রে দেখ্ব।"

১৭

পরের দিন অনেক বেলায় ইন্দিরার ঘুম ভাঙ্গিল। উৎসব-ক্লান্ত তাহার মন কিছুতেই শয্যার স্নেহালিঙ্গন ত্যাগ করিয়া উঠিতে চাহিতেছিল না। বাহিরে মাঝে মাঝে পথ-গামী মোটরের ভেঁপু শোনা যাইতেছিল। ধরণীর কর্ম্ম-মন্দির যাত্রা নিরুদ্বেগে চলিয়াছে।

রোদের সোনালি আলো ইন্দিরার অন্তরে আনন্দ জাগাইয়া তুলিল। শয্যাত্যাগ করিয়া, প্রসাধন শেষ করিয়া সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। বিকালে ষ্টীমারে যাইতে হইবে বলিয়া বন্ধুর দল সবই যে যার বাড়ী গিয়াছে।

পিতার পাঠ-কক্ষের পানে চাহিয়া সে দেখিল, পিতা সেখানে নাই। প্রভাতের শান্ত মাধুর্য্য ইন্দিরাকে খুসী করিল। সে আপন মনে গাহিতে লাগিল :—

"আজ আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও ;
আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধূলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।"

গুন্-গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে পিতার পাঠ-কক্ষে সে প্রবেশ করিল। দেখিল, দেরাজ খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। দেরাজে চাবী লাগানো ছিল। চাবী দিয়া দেরাজ বন্ধ করিতে গিয়া দেখিল, দেরাজের মধ্যে একখানি সুন্দর নোট-বুক—ইন্দিরা কখনও পিতার দেরাজে কি আছে না আছে, দেখে নাই। নোট-বুক দেখিয়া কৌতূহলভরে সে বইখানি তুলিয়া লইল।

সেখানি জ্যোতিঃপ্রসাদবাবুর ডায়েরী। ইন্দিরা ধীরে ধীরে পাতা উল্টাইতে লাগিল। পিতার প্রবাস-জীবনের নানা চমকপ্রদ কাহিনীর কথা তাহাতে লেখা আছে। ইন্দিরার মনে হইল, পিতার জীবন-কথা সে পড়িবে না। কিন্তু কৌতূহল সমস্ত ধীর বুদ্ধিকে জয় করিল, মন্ত্রমুগ্ধের মত সে পড়িয়াই চলিল। পড়িতে পড়িতে নানা ভাবের দোলায় তাহার মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পড়া শেষ হইলে, সে টলিতে টলিতে আপন ঘরে চলিল।

বাহিরের স্নিগ্ধ আলো তখনও অম্লান জ্বলিতেছিল। পথচারী পথিকের হাস্য-কোলাহল দিগন্ত মুখর করিতেছিল। কিন্তু ইন্দিরার মনে হইল, যেন সমস্ত জগৎ দুলিতেছে।

ইন্দিরা পিতার বিবাহিত পত্নীর সন্তান নয়, একথা ভাবিতেই ইন্দিরার সমস্ত মন ক্লিন্ন ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু অধ্যাপকতা করিবার সময়ে এক দেশীয় রাজ্যে রাজার বিধবা পুত্রবধূর শিক্ষকতা করেন। তরুণী বধূর সহিত শিক্ষকের প্রণয় জন্মে। সেই অবৈধ প্রণয়ের ফলেই ইন্দিরার জন্ম। তার পিতার ঐশ্বর্য্য সেই রাজ-পুত্রবধূর দেওয়া ধনে সৃজিত।

ডায়েরীর পাতায় জীবনের এই হারানো কাহিনী, এই অজ্ঞাত সত্য জানিতে পারিয়া ইন্দিরার দুঃখ ও বেদনার সীমা রহিল না। শীতাংশুর সহিত আলাপ আলোচনায় সে মাঝে মাঝে নারীর অধিকারের দাবী করিয়া বলিত—সতীত্ব বড় দরের জিনিষ নয়; কিন্তু মনে-প্রাণে সতীত্বের প্রতি একটী বিরাট্ শ্রদ্ধা তাহার ছিল। আজ আপন জন্ম পরিচয় জানিতে পারিয়া ইন্দিরা ক্ষোভে ও অভিমানে শয্যায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনা তাসের প্রাসাদের মত নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

দাসী আসিয়া জানাইল, "দিদিমণি, চা দেব?" কঠোর স্বরে তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া সে উত্তর দিল, "যাও, বিরক্ত করো না।"

ইন্দিরা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বাতায়নের ফাঁকে রোদের ঝলক্ আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার দীপ্ত মাধুরীর পানে চাহিয়া সে আপন রাজপুতানী মায়ের কথা ভাবিতেছিল। সেই মা কি এখনও বাঁচিয়া

আছে? তাহার মা ত স্নেহহীনা নহে। কন্যার ভাবী শিক্ষার জন্য আপন দয়িতের নিকট তাহার মা আপনার সমস্ত সম্পৎ দিয়াছে। সে মা যে তাহাকে আপন বলিয়া আদর করে নাই, তাহার জন্য তাহার মায়ের কোন দোষ নাই; সমাজ-নীতিই দূষণীয়। শীতাংশুর কথা তাহার মনে পড়িল, "সন্তান ত পিতামাতার লালসায় জন্মে, বিবাহের নিগূঢ় বাঁধনে জন্মিলেই তাহার মর্য্যাদা, আর তাহার বাহিরে জন্মিলেই অমর্য্যাদা, ইহার কোন হেতু নাই। জনক ও জননীর মধ্যে সত্যকার ভালবাসা থাকিলেই সন্তানের ভাবী মঙ্গল হয়, একথা যদি সত্য, তবে সমাজ-রীতির বাহিরে প্রণয়ের ফলে যাহারা জাত, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবার কিছুই নাই।"

শীতাংশুর রচনায় একথা সে বহুবার শুনিয়াছে, এ তত্ত্ব সে বহুদিন আলোচনা করিয়াছে। কাব্য ও সাহিত্যের সমস্যা ভাবিয়া যখন এ বিষয় লইয়া তর্ক করিয়াছে, তখনকার আলোচনায় কোনও বেদনা ছিল না। কিন্তু শীতাংশুর বাণী আজ তাহার অন্তরে সত্যকার সাড়া দিতেছিল না; তথাপি এ যুক্তিকে নাড়িয়া চাড়িয়া এই যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া সে আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

নানা বিরোধী ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে ইন্দিরার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যে নিজেকে কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছিল না। সকালে উঠিয়া যে আনন্দে সে আলোকের ঝরণাধারার আবাহন করিয়াছিল, সে আনন্দ যেন আর নাই। ধূলির শয়ন শেষ করিয়া, সে আলোকের মাঝে জাগিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশের সে পুলক তাহার ভাগ্যে জুটিল না। ইন্দিরা অনুভব করিল, যেন ভাবী জীবন ধরিয়া তাহাকে কেবলি

আত্মগোপন করিয়া চলিতে হইবে। সত্যের যে হিরণ্ময় জ্যোতিকে সে জীবনের পথশিখা করিয়া লইয়াছিল, তাহাকে বিদায় দিয়া অসত্যের অন্ধকারে পথ চলিতে হইবে।

তাহার পোষা কাবুলী বিড়ালটী আসিয়া মনের আনন্দে লেজ ফুলাইয়া ডাকিল, "মিও।" স্বামিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নাচিয়া নাচিয়া ডাকিতে লাগিল "মিও, মিও।" ইন্দিরা আজ তাহাকে আদর করিল না।

বিড়ালটীকে দেখিয়া তাহার হিংসা হইতে লাগিল। যে আত্মভোলা আনন্দে বিড়াল খেলিতেছে, তাহার কণাংশ পাইলেও সে যেন সার্থক হইয়া যায়। প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষ করিয়া চলে না। তাই ত উহাদের কোন বেদনা নাই। মানুষই যে কেবল প্রকৃতির সহিত রণ করিয়া ক্লান্ত ; প্রাকৃতিক আকর্ষণে যে যুবক-যুবতী মিলিত হইয়াছে, সে মিলনকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াই ত সমাজ চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব গড়িয়া তোলো।

সে স্নান করিতে চলিল। ভাবিল, স্নান করিলেই তাহার তপ্ত মস্তিষ্ক কথঞ্চিৎ শীতল হইবে। সে "বাথ-রূমে" যাইয়া আধঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ইন্দিরার মন অনেকটা শান্ত হইল। কাপড় পরিয়া বাহিরে আসিতেই পিতার সহিত দেখা। আজ সে আর পিতার মুখের দিকে শান্ত-দীপ্ত চোখ তুলিয়া সহজ ও সুন্দরভাবে কথা বলিতে পারিতেছিল না। দ্বিধা আসিয়া স্নেহপরায়ণ পিতা ও ভক্তিমতী কন্যার মধ্যে বিরাট ব্যবধান গড়িয়া তুলিতেছিল।

জ্যোতিঃপ্রসাদ এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "সকালে

উঠেই মা, আমি গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলাম। 'মে-কুইন' বেশ সুন্দর জাহাজ। তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।"

কন্যার দিকে আনন্দের বা উল্লাসের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবাক্ হইয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। কন্যার পাণ্ডুর ও ম্লান মুখ দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মা, তোমার কোন অসুখ করেছে কি?" ইন্দিরা নত নয়নে উত্তর দিল, "না বাবা, তবে শরীরটা তত ভাল নেই।"

"বাড়ী এসে সত্যব্রতের এক চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, সে আস্‌তে পার্‌বে না। তবে কাল সন্ধ্যার সময়ে তার বাবা এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌বেন। কাজেই আমি যেতে পারব না। কিন্তু তাতে বোধ হয় কোনও অসুবিধা হবে না; কারণ তোমরা ত অনেকে থাক্‌বে।"

কন্যার পক্ষ হইতে কোন উৎসাহ বা অনুৎসাহ না দেখিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ অবাক্ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, হয়ত সত্যব্রতের অনুপস্থিতি কন্যার নিকট প্রীতিপ্রদ হয় নাই।

খানিক থামিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ পুনর্ব্বার বলিলেন, "মা, দেবব্রত আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমার কথা তিনি ফেল্‌তে পার্‌বেন না। যদি তোমার অমত না হয়, তবে কথাটা পাড়ি।"

কি কথা, ইন্দিরার বুঝিতে বাকী রহিল না। সত্যব্রতের সহিত ইন্দিরার বিবাহ দিবার ইচ্ছা জ্যোতিঃপ্রসাদ অনেক দিন ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছেন, একথা কন্যার অজ্ঞাত ছিল না।

সত্যব্রতের পৌরুষ আর চরিত্রমাধুর্য্যও ইন্দিরাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কাজেই এ পরিণয়ে তাহার দিক্ দিয়াও কোন আপত্তির

কিছু ছিল না। উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধনও দিনে দিনে প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ইন্দিরার পক্ষে আজ প্রশ্নোত্তর দেওয়া মুস্কিল হইয়া পড়িল। সত্যব্রতের মনে ভারতীয় সাধনার ভাবধারা বিশেষভাবে প্রিয়, একথা ইন্দিরার অজ্ঞাত ছিল না; আপন জন্মপরিচয় লইয়া তাই ইন্দিরা কিছুতেই সত্যব্রতকে স্বামীত্বে বরণ করিতে সাহস করিতেছিল না। কিন্তু কন্যার মঙ্গল-ব্যাকুল অসন্দিগ্ধ পিতাকে, মনের এই সঙ্কোচের কথা বলা চলে না। কাজেই সে ধীরে ধীরে জবাব দিল, "বাবা, আপনি যা ভাল বুঝেন তাই ক'র্বেন।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, "না মা, আমার ইচ্ছার ভার দিয়ে আমি কোন দিনই তোমায় বদ্ধ ক'রে রাখ্তে চাই নি। আজও আমার ইচ্ছা যেন তোমার স্বাধীন মতকে আড়ষ্ট না করে—"

ইন্দিরা বাধা দিয়া বলিল, "না বাবা, আমার কোনও মতামত নেই; আপনি যা করেন, তাই আমার ইচ্ছা।" এই বলিয়া ইন্দিরা ত্রস্তপদে চলিয়া গেল।

জ্যোতিঃপ্রসাদ বুঝিলেন, কন্যার লজ্জা হইয়াছে। তাই তিনি প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

১৮

গঙ্গার উচ্ছল জলধারা বাহিয়া 'মে-কুইন' চলিল। নদীপথে ভ্রমণে মানুষের চিত্তে অপূর্ব্ব এক আনন্দরসের উদ্ভব হয়। চারিদিকে জাহাজ ও নৌকা ভিড় করিয়া রহিয়াছে। লোকের উঠা-নামা চলিতেছে।

ইন্দিরার মনে হইল, কর্ম্ম-চঞ্চল পৃথিবীর কল-কোলাহলই তাহার সব চেয়ে পরম মাধুরী। ক্ষণিকের জন্য সে অন্তরের দাবদাহ ভুলিয়া গেল।

নীল আকাশে লঘু মেঘখণ্ড ভাসিয়া চলে। বর্ণভঙ্গিমায় আকাশে নানা স্তর ও দেশ সৃজিত হইয়াছে। তাহার তল দিয়া গোধূলির স্নিগ্ধ আলোকে বলাকারা ভাসিয়া চলে। তীরে দুই পারে সৌধশ্রেণী, আর মাঝে মাঝে অযত্নবর্দ্ধিত দু'একটী বনস্পতি। ইহার মধ্য দিয়া লঞ্চ্ চলিল। ইন্দিরা পুলকিত হইয়া উঠিল।

কাজকে কেন লোকে বোঝা বলিয়া মনে করে? চারিদিকে যত কাজের ভিড়, যত লোকের মেলা—সব দেখিয়া ইন্দিরা মহা খুসী হইল। এই কর্ম্মস্রোতের সহজ গতির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে হয়ত মুক্তি হইত!

সত্যব্রত আসে নাই, শীতাংশু, রেখা ও সুলেখা প্রভৃতিকে লইয়া খোস-গল্পে মাতিয়াছে। ইন্দিরাকে পীড়া দিবার জন্যই শীতাংশু সকলের সম্মুখে রেখার প্রতি আপনার প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছিল।

প্রণয়ের এই লীলাচাতুর্য্য ইন্দিরাকে আজ আর উত্যক্ত করিতে পারিল না। আপনার জন্মরহস্য জগদ্দল পাথরের মত তাহার বুকে বোঝা হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, সামাজিক নিয়ম-কানুনের নিগড় না মানিয়া যাহারা প্রেমের মাঝে মিলিয়াছিল, তাহাদের সন্তান কেন মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বহিবে। বিবাহ না হইলেও বা কি, তাহার পিতামাতা সত্যকার প্রণয়ী ছিলেন—তাঁহাদের স্নেহের ও কামনার ধন ইন্দিরা। লোকচক্ষে সে কেন হেয় হইবে?

দ্বিধা আসিয়া প্রশ্ন করে—যে প্রেম লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনতায়

ফুটিয়াছে, সে প্রেম কি কখনও শুদ্ধ হইতে পারে ? ভয়ে ও সঙ্কোচে যাহার সংঘটন, তাহা কখনও কল্যাণ ও মহিমার কারক হইতে পারে না। দ্বিধা তাই ইন্দিরাকে বড় ব্যাকুল করিয়া ফেলে।

নীরেশ আসিয়াছিল। ইন্দিরাকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, "আজকের চলাটা আমার মনে ভাল লাগ্‌ছে—এই চলার সুরটাকে, এই গতির আনন্দকে আমি রাগিণীর মাঝে বাঁধতে চেষ্টা কর্‌ছি।"

নীরেশর কথায় ইন্দিরা মহা খুসী হইল। আপন চিন্তার ভার ভুলিয়া সে উত্তর দিল, "তাই করুন, পুরাণের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রে কিছু বড় তৈরী করা চলে না, নূতন স্মৃষ্টির নূতন অনুভূতি চাই; আপনি তাই ওস্তাদীকে আমল না দিয়ে রস-সংবেদনাকে জাগিয়ে তুলুন, তাহ'লে দেশের মহদুপকার ক'র্‌তে পার্‌বেন।"

নীরেশের সহিত যোগেশের বন্ধু নরনারায়ণ আসিয়াছিল। নীরেশ তাহাকে ইন্দিরার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, "ইনি মস্ত বড় শিকারী, সঙ্গে বন্দুক নিয়ে এসেছেন।"

ইন্দিরা সস্মিতভাবে বলিল, "আপনার বন্ধুকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাই, কিন্তু শিকার করাকে আমি ভাল মনে করি না। নিরীহ জন্তুকে বধ করার মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও, ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।"

নরনারায়ণ বলিল, "আপনি যদি না রাগেন ত বলি, সারা জগৎ ভ'রে অহরহ মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চ'ল্‌ছে। সৃষ্টি ও বিনাশের বাঁশী যুগপৎ বাজছে। মৃত্যুকে তাই কোমলতা দিয়ে দেখ্‌লে নিষ্ঠুরতা ব'লে মনে হয়; কিন্তু শিকার ক'রতে গিয়ে মানুষের জ্ঞান কত দিকে যে কত বেড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।"

যোগেশ ইতিমধ্যে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "ভাল, তোমার ত বনের ছবি আছে। সেগুলি ম্যাজিক-লণ্ঠনে পুরে আজকার রাতকে আনন্দমধুর ক'রে তোলো না কেন ?"

নরনারায়ণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্দিরার সম্মতি প্রার্থনা করিয়া বলিল, "তাতে আমার অমত নেই, সকলের মত হ'লে দেখাতে পারি।"

ইন্দিরা বলিল, "আপনি বুঝি অনেক শিকার করেছেন ?" নরনারায়ণ উত্তর দিল, "তা ক'রেছি ব'ল্‌তে হবে। অল্প বয়সে বই-পড়া জিনিষটাকে মাথার বোঝা মনে ক'রে মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে পড়ি। য়ুরোপীয় শিকারীদের চমকপ্রদ শিকারকাহিনী প'ড়ে আমার মনেও শিকারী হওয়ার অনুপ্রেরণা জাগে। তারপর সুন্দরবনে, আসামে এবং ভারতের অন্যত্র শিকার ক'রে আর শিকারীদের ছবি তুলে আমার জীবন কেটে গেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রুদ্র তার ডমরু বাজিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে উদরস্থ ক'র্‌ছেন, আমি যদি তাতে দু'এক সংখ্যা বাড়িয়ে দেই, ক্ষতি কি ?"

ইন্দিরা কথা কহিল না। নরনারায়ণ আপন মনে নিজের বিপৎ-সঙ্কুল ভয়াবহ অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করিয়া চলিল। ভয়ের গল্প পড়িলে বা শুনিলে আমরা উল্লসিত হই—নরনারায়ণের গল্প বলিবার চাতুরী জানা ছিল, সে নিজের বিজয়বার্ত্তার চমকপ্রদ কথা বলিয়া ইন্দিরাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

রাত্রি আটটায় ষ্টীমারের ডাইনিং হলে সকলের ভোজনের শেষে নরনারায়ণ ম্যাজিক-লণ্ঠন লইয়া ছবি দেখাইতে লাগিল। তাহার বলিবার ভঙ্গীটি অতি সুন্দর। বাক্যের কুহকজাল দিয়া, সে যখন সত্যকার ভয়াল জন্তুর সহিত আপন সাক্ষাতের বর্ণনা করিয়া চলিল, তখন শ্রোতারা

সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল, আসামের জঙ্গলের বন্য হস্তীর ছবি—লতা-গুল্ম-পাদপসমাকীর্ণ জঙ্গলের আলো-ছায়াভরা চিত্র, সুন্দরবনের ভীষণ ব্যাঘ্র, সর্প, বন্য মহিষ, নেপালের তরক্ষু প্রভৃতির চিত্রগুলি সত্যই আশ্চর্য্যজনক। ইহাদের ছবি ছাপা-পুস্তকে অনেকে দেখিয়াছে। কিন্তু সত্যকার কোনও পরিচিত বন্ধু বনবাসী এই সব ভয়ানক জানোয়ারের সহিত মিতালি করিয়া ফিরিয়াছেন, ইহা জানিলে আনন্দের সীমা থাকে না। নরনারায়ণের কৃতিত্বে তাই শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই প্রীত এবং তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ছবি দেখান শেষ হইলে শীতাংশু উঠিয়া নরনারায়ণের পৌরুষ ও বীরত্বের প্রশংসা করিয়া অভিনন্দন জানাইল।

রাত্রে শুইয়া ক্যাবিনের ফাঁকে মেঘহীন আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ ইন্দিরার দৃষ্টিপথে পড়িতেছিল। বিছানায় শুইয়া নিদ্রাহীন চোখে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যেন ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। যে জন্ম-পরিচয় শুধু তাহাকে লজ্জার পাথারে ডুবাইবে, কোন্ অভিশাপে আকাশের ওই অচেনা তারাগুলি তাহার ভাগ্য-পটে সেই কলঙ্কের জ্বালা লিখিয়া রাখিয়াছে!

রাত্রিতে স্বপ্ন আসিয়া ইন্দিরার মস্তিষ্ক তপ্ত করিয়া তুলিল। সে দেখিল যে, একটা ভীষণ অজগর তাহাকে তাড়াইয়া আসিয়াছে। প্রাণভয়ে সে পলাইতে পারিতেছে না। নিরুপায় হইয়া সে যেন অজগরের মুখগহ্বরে আত্মসমর্পণ করিতেছে। তাহার চাপা চীৎকার শুনিয়া পাশের কক্ষে সুপ্ত সুলেখা জাগিয়া বলিল, "কি হয়েছে সই?"

ইন্দিরা জাগিয়া, ত্রাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া বলিল, "কিছু নয়! একটা দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।"

সে আর কোন কথা কহিল না। রাত্রির প্রহরগুলি অন্ধকারের সেতু পার হইয়া বাহিয়া চলিল।

১৯

প্রভাতের অনিন্দনীয় মাধুরীর মাঝে ইন্দিরা চোখ মেলিয়া চাহিল। আলোকের ফল্গুধারায় গত রাত্রের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া সে বিস্ময়মুগ্ধচিত্তে পৃথিবীর মাধুর্য্যকে অভিনন্দন করিল। ষ্টীমার শ্যামশস্পভরা একখানা ময়দানের প্রান্তে আসিয়া নোঙ্গর করিয়া আছে। তাহার পাশ দিয়া একটী খাল দু'ধারের ধানের ক্ষেত আর বন্য গাছের মাঝ দিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছে।

বেলা যখন আটটা। রৌদ্রের কনক-কান্তিতে সমস্ত দিক্ সমুজ্জ্বল। ইন্দিরা যখন স্নান সারিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল, তখন যোগেশ আসিয়া বলিল, "উঠ্‌তে অনেক দেরী হয়ে গেছে!" মডেল হইয়া বসিবার সময় হইতে, যোগেশের সহিত ইন্দিরার হৃদ্যতা বাড়িয়া গিয়াছে। যোগেশ. এখন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই ব্যবহার করে।

ইন্দিরা বলিল, "হ্যাঁ, কাল শেষ রাতে একটা দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, তারপর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় খানিকটা ঘুমিয়ে নিলুম। ভাল কথা, এ দিকের আয়োজন ত ঠিক হয়েছে?"

যোগেশ বলিল, "সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। মাঠের মাঝখানে একটা ভারী সুন্দর আম-বাগান আছে। তার তলাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মনে হয় কে যেন ঝাঁট দিয়ে রেখেছে। ওখানেই চড়ুইভাতির

সব আয়োজন ঠিক হয়েছে। নরনারায়ণ খালধার বেয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছে। তার বিশ্বাস, খানিকটা গেলেই ভাল শিকার মিল্‌বে।”

ইন্দিরা প্রশ্ন করিল, “আর সকলে ?”

“মেয়েরা ত তোমার জন্য অপেক্ষা ক’রছেন, শীতাংশু, নীরেশ প্রভৃতি আম্রকুঞ্জে গানের মজলিস বসিয়েছে।”

সুলেখার পিস্‌তুতো বোন অমিতা ডায়োসেসন কলেজে আই-এ পড়ে। আজন্ম কলিকাতায় কাটিয়েছে। সুলেখারা ভ্রমণে বাহির হইতেছে শুনিয়া সেও সঙ্গ লইয়াছে। গত কল্য ইন্দিরার সহিত তাহার বিশেষ আলাপ পরিচয় হয় নাই। আজ প্রথম দেখা হইলেই সে চিরপরিচিত বন্ধুর মত বলিল, “ইন্দিরা-দি, সত্যই আপনাকে ইন্দিরার মত দেখায়। আপনার মত রূপসী বাঙালী মেয়ে আমি দেখি নি।”

আত্মপ্রশংসার এই বাক্য অন্য সময়ে হয় ত ইন্দিরাকে খুসী করিত। কিন্তু আজ ইহাতে সে যেন ব্যথার ইঙ্গিত পাইয়া বসিল। আত্মস্থ হইয়া বলিল, “না বোন, যে রূপ মানুষের ভিতর বাহির উজ্জ্বল করে, তা আমার নেই। ও কথা থাক্‌, জলযাত্রা তোমার কেমন লাগ্‌ছে ?”

উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে বলিল, “বড্ড ভাল লাগ্‌ছে ইন্দিরা-দি ! কাল সারারাত আমি ডেকে ব’সে জাহাজের চলা দেখেছি। সার্চ্চ-লাইটের আলোয় বনস্পতি-শ্যামল তীর আর জলস্রোতের যে নিরুপম সৌন্দর্য্য দেখেছি, জীবনে তা ভুল্‌ব না। সুষমার এই ভাণ্ডার ফেলে, মানুষ কেন সহর গড়ে তোলে, এই ভেবে আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি !”

সুলেখা আসিয়া অমিতাকে পরিচয় করিয়া দিবার জন্য বলিল,

"অমিতা বড় ভাল মেয়ে। ওর লেখা কবিতা তুমি বোধ হয় বাঙলা মাসিকে দেখেছ।"

অমিতা সুলেখার মুখে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "যাও দিদি, তুমি ভারী দুষ্টু। আমার সে লেখার কথা কি কাউকে বলে!"

ইন্দিরা হাস্যোদ্দীপ্ত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তাই নাকি? তুমি তাহ'লে কবি!"

অমিতা আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহে না। কথার মোড় ঘুরাইয়া বলিল, "ইন্দিরা-দি, তোমার যদি মত হয়, তাহ'লে চল আমরা নিজেরাই রান্না করি। তবে খুব মজা হবে!"

রেখা বলিল, "ও শুধু কবি নয়, রন্ধনেও দ্রৌপদী।" ইন্দিরা উত্তর দিল, "দ্রৌপদী কবিতা লিখ্‌তেন কিনা, বেদব্যাস মহাভারতে তা লেখেন নি। অকবি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী জুটেছিল, কবি দ্রৌপদীর ক'জন জুট্‌বে?"

অমিতা রঙ্গ শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর দিল, "যান্ দিদি, আপনি ভয়ানক দুষ্টু, অমন ক'র্‌লে আমি ভয়ানক চ'টে যাবো।"

"তা চ'ট্‌তে পার, কিন্তু তাতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় লোকাভাব হবে না। আচ্ছা ঠাট্টা থাক্, তোমাদের যদি সকলের ইচ্ছে হয়, চল নিজেরাই রান্না করা যাবে।"

ঘাসে-ভরা তীর, মখমলের বিছানার মত নরম। তাহার পাশেই পল্লবছায়াচ্ছন্ন আম্রবন। সেখানে মহানন্দে রান্নার মহোৎসব চলিল। রান্না শেষ করিয়া সকলে একত্র বসিয়া পরম উল্লাসের সহিত ভোজন শেষ করিল। ষ্টীমারে ফিরিতে বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল।

বৈকালে নরনারায়ণ বলিল, "চলুন, শিকারে যাওয়া যাক্। শীতাংশু, নীরেশ প্রভৃতি ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেখাইল না।" সুব্রত বলিল, "ভাই, কথা নিয়ে শিকার আমাদের চলে বটে, কিন্তু পশু ও পাখী নিয়ে খেলা পোষাবে না। তবে খানিক দূর বোটে ক'রে বেড়িয়ে আস্তে রাজি আছি।"

শীতাংশু বলিল, "সেই ভাল। জলি-বোট ক'রে আজ সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ ক'রতে পারি!"

নরনারায়ণ নবাগত অতিথি। কেহই তাহার প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাইতেছে না দেখিয়া ইন্দিরা চটিয়া উঠিল, সহসা বলিয়া ফেলিল, "নরনারায়ণবাবু, আপনি আমায় নিয়ে যেতে চান্ ত চলুন। কাল আপনার তোলা ছবি দেখে আসল শিকার দেখ্‌বার জন্যে খুব ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু আপনাকে আর একটা বোট কিম্বা ডিঙি জোগাড় ক'র্‌তে হবে।"

যোগেশ বলিল, "তার জন্যে ভাবনা কি? জেলেরা মাছ ধরতে এসেছে, ওদের সঙ্গে অতিরিক্ত একটা ডিঙি আছে, কিছু পয়সা দিলেই দিয়ে দেবে।"

অপর সকলে ইহাতে মহা অসন্তুষ্ট হইয়া গেল। ইন্দিরা যে তাহার পুরাতন পরিচিত বন্ধুদের তুচ্ছ করিয়া, নবাগত নরনারায়ণের প্রতি অনুরাগ দেখাইতেছে, ইহাতে ঈর্ষ্যা ও অভিমানে অনেকে জ্বলিতে লাগিল।

নরনারায়ণ মহোৎসাহে জেলে ডিঙ্গি লইয়া আসিল। তাহার পর নিজের বন্দুক ও রিভলবার লইয়া যাত্রার জন্য উদ্যোগী হইল। দলের

অপর কেহই নরনারায়ণের অভিযানে উৎসাহ দেখাইল না বা আনন্দ প্রকাশ করিল না। নরনারায়ণ, যোগেশ ও ইন্দিরা ডিঙিতে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। নরনারায়ণ অন্য সবাইকে যাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু কেহই আগ্রহ দেখাইল না। অমিতার যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যাওয়া দিদিদের মনঃপূত হইবে না ভাবিয়া নিরস্ত রহিল।

অন্য সকলে জলি-বোট করিয়া ঘুরিতে বাহির হইল। ক্ষিপ্র ক্ষেপণী চালনা করিয়া নরনারায়ণ তীরবেগে খাল বাহিয়া ছুটিল। খালের শোভা কি চমৎকার! দু'পাশে বনজ তরুলতা, তীরে হোগ্‌লা ও হেলির বন, কোথাও কেওড়া ও ছৈলা গাছের জঙ্গল, কোথাও বুনো নারিকেল গাছ। তাহার মাঝ দিয়া খাল, অজানা অরণ্যের মধ্যে ঢুকিয়াছে। খানিক দূর গিয়া একটা শিমুল গাছে নরনারায়ণ এক ঝাঁক হরিয়াল দেখিতে পাইল। ডিঙ্গিতে বসিয়াই সে বন্দুক ছুড়িল। এক গুলিতেই একজোড়া হরিয়াল মাটিতে পড়িল। তীরে ডিঙ্গি লাগাইয়া নরনারায়ণ হরিয়াল নিয়া আসিল। হরিয়াল দু'টির সুন্দর চেহারা, হরিদ্রাভ সবুজ রঙ্‌ ইন্দিরার মনকে বেদনায় কাতর করিয়া তুলিল। সে নরনারায়ণকে কহিল, "না, আপনি পাখী মার্‌তে পাবেন না। এই নিরীহ পাখী মেরে আপনি কি আনন্দ পান?"

নরনারায়ণ কৌতূহলে বক্তার করুণাদীপ্ত মুখের পানে অনুশোচনা জানাইয়া বলিল, "আপনার যখন দুঃখ আছে, তখন এদের আর মার্‌বো না।"

খানিক দূর যাইতেই একটা বাচ্চা কুমীরের দেখা পাওয়া গেল। যোগেশ মহোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐটাকে মার।"

নরনারায়ণ বলিল, "মারতে ত পারি, কিন্তু ব্যাটার পিছনে পিছনে অনেক দূর ছুট্‌তে হবে। গুলি খেলেই ব্যাটা বোঁ বোঁ ক'রে ছুট্‌বে।"

ইন্দিরা বলিল, "একটা কিছু বড় শিকার না নিয়ে ফির্‌লে ওদের কাছে মুখ দেখান যাবে না। আমাদের এখানে কোথাও নামিয়ে দিন! তারপর কুমীরটাকে মারুন।"

যোগেশ সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দিক্‌টায় জঙ্গলের ধারে ধানের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। ধানের ক্ষেতের পাশে চাষীরা যে চালা বেঁধেছিল, এখনও তা' খাড়া হয়ে রয়েছে। ঐখানেই নামিয়ে দাও। কিন্তু তুমি একা বিপদে প'ড়বে না ত?"

নরনারায়ণ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "প্রাণের ভয় ক'র্‌লে ভাই, শিকারী হওয়া চলে না। পরকে মার্‌তে গেলে নিজেও মর্‌তে পারি, এ-কথা জেনেই যেতে হয়। সেজন্য তুমি উতলা হ'য়ে উঠো না। কিন্তু এখানে ওঁর কষ্ট হতে পারে, তাই ভাবছি।"

ইন্দিরা বলিল, "সেজন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। আমার কোনই কষ্ট হবে না। কিন্তু আপনি বেলাবেলিই ফির্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বেন। কুমীরের পিছনে ছুটে বেঘোরে বিপদে না পড়েন।"

"ধন্যবাদ! বেঘোরে পড়বার ভয় করি না। তবে যদি কিছু দেরী হয়, তা'তে কিছু মনে ক'র্‌বেন না।"

ইন্দিরা ও যোগেশ ধানের ক্ষেতের মাঝে দাঁড়াইয়া রহিল। নরনারায়ণ তীরবেগে ডিঙ্গি ছুটাইয়া চলিল। স্রোতের গতি আর ক্ষেপণী-চালনার দ্রুততা নৌকাকে পাখীর ন্যায় উড়াইয়া লইয়া চলিল। কিছু পরে বন্দুকের গুলি শোনা গেল। দশ মিনিট পরে পুনরায় শব্দ আসিল,

"হুড়ুম্, দড়াম্।" তাহার পর বিরাট্ নিস্তব্ধতা। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অলস প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিল, তথাপি নরনারায়ণের দেখা নাই। এমন সময়ে আকাশে কালো মেঘ জমিয়া উঠিল। ঈশান-কোণ হইতে জাগিয়া, জমাট মেঘের রাশি সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। কাল-বৈশাখীর প্রলয়-হুঙ্কারে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। যোগেশ ও ইন্দিরা নদীতীর ছাড়িয়া চালাতে আশ্রয় নিল। সাত-আটখানি বাঁশের খুঁটির উপর খড়ের চাল। তাহার মধ্যেও বৃষ্টির ছাট আসিয়া পড়িতে লাগিল। ফাল্গুনের মধুর অপরাহ্নে কাল-বৈশাখীর এ ভীষণ ডঙ্কা বাজিবে, কেহই ঘুণাক্ষরে এ সন্দেহ করে নাই। ষ্টীমার এখানে ঢুকিতে পারে না। কাজেই আশঙ্কায় ও ভয়ে, যোগেশ ও ইন্দিরা উভয়েই মুহ্যমান হইয়া পড়িল। দু'জনের মনে লক্ষ চিন্তা খেলিয়া যাইতে লাগিল। কেহই যেন কথা কহিতে পারিতেছিল না। বাহিরে শুধু বাতাসের ক্রুদ্ধ শোঁ শোঁ শব্দ আর অবিরাম জলবর্ষণের শব্দ বাজিয়া চলিল।

২০

কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝা যখন ডায়মণ্ডহারবারের নিম্নে আমাদের আনন্দকামী যাত্রীদের মনে ভয় ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিল, কলিকাতায় তখন জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু 'চেরী-ভিলায়' বাল্যবন্ধু দেবব্রত সেনের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। বন্ধুকে সমাদর করিবার জন্য জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। সুসজ্জিত হল-ঘরে বসিয়া সান্ধ্য-ভোজন

করিতে করিতে উভয়ের আলাপ চলিতেছিল। হল-ঘরে ইন্দিরার সুবৃহৎ তৈলচিত্র ছিল। পিছনের বড় আয়নায় তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া অনিন্দ্য-মধুর দেখাইতেছিল। দীপ্তিময় প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেবব্রতবাবু বলিলেন, "বাঃ! তোমার মেয়েটীর ত বেশ লক্ষ্মীমন্ত চেহারা। কন্যার প্রশংসায় পিতা মুগ্ধ হইলেন। তৈলচিত্রের দিকে চাহিয়া বিস্মিত একখানি মুখের কথা মনে পড়ে। প্রথম বয়সের সে প্রণয়ের কথা ভুলিয়াও ভোলা যায় না। ভাবস্রোত বন্ধ করিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ কহিলেন, "তা ঠিক ভাই, সকলেই আমার মেয়ের রূপের প্রশংসা করে। কিন্তু ভগবতীর এমন রূপ কোথায় অযত্নে নষ্ট হবে, সেই ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি ভাই।"

জ্যোতিঃপ্রসাদের ইঙ্গিত দেবব্রতবাবু বুঝিলেন। কিন্তু সহসা কি উত্তর দিবেন না পাইয়া, আহারেই মনোনিবেশ করিলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন, "ভাই, আমাদের যুগ চলে গেছে। তখন বাপ-মা যাকে গলায় বেঁধে দিতেন, তাকেই জীবনসঙ্গিনী ক'রে জীবনের দীর্ঘপথ চ'লতে হ'ত। এখন তা আর হ'বার নয়।"

সত্যব্রত ও নমিতার বন্ধুত্ব দেবব্রতবাবুর ভাল লাগে নাই। এ সম্বন্ধে অলীক জনরব তাহার কর্ণ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই কারণেই তিনি পল্লীর শান্ত আশ্রয় ছাড়িয়া পুত্রের সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। নমিতার সহিত আলাপে তাহার মধুর সৌজন্য ও সৌম্য ব্যবহার তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি বয়স্ক অবিবাহিত পুত্রের পক্ষে এরূপ নারীর সান্নিধ্য ও সৌহৃদ্য তাঁহার মনোমত হয় নাই। নর ও নারীর মাঝে শোভন ও অকপট বন্ধুত্ব থাকিতে পারে, একথা

তিনি বুঝিয়াও বুঝেন না। কাজেই পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রকে সংসারী করিবেন, এ কল্পনা তাঁহার মাথার মধ্যে খেলিতেছিল।

জ্যোতিঃপ্রসাদ দেবব্রতবাবুর আক্ষেপের কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, আকারে ও ইঙ্গিতে বন্ধুর মনোভাব অনুমান করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "অতীতের দিকে চেয়ে বর্ত্তমানের নিন্দা ক'রে লাভ কিছু নেই। আমরা ভাবি আমাদের গত জীবনের মাঝেই বুঝি সমস্ত মধু ছিল। আমাদের ছেলেরাও ঠিক সেই কথা ভাবে। কিন্তু সে আলোচনার দরকার নেই, তোমার ছেলে সত্যব্রত ত আদর্শ সন্তান। এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবক আজকাল পাওয়াই দুর্লভ।"

বন্ধুর কথাগুলি তাঁহার হৃদয়ে তড়িৎ-রেখার মত যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা জাগাইয়া তুলিল। আপন পুত্রকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, আর জানেন, পিতার সন্তোষের জন্য পুত্র সব কাজ করিতেই প্রস্তুত। কিন্তু দেবব্রতবাবুর ভয়, পুষ্পে কীট সম মানুষের মনে যে তৃষ্ণা জাগিয়া আছে, তাহার প্লাবন হয়ত অকস্মাৎ পুত্রকে বিপথে চালাইয়া লইতে পারে। থামিয়া প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য বলিলেন, "ভাই, তুমি যা ব'ল্‌ছ তা সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান যুগ স্বাধীনতার যুগ, আমার যা মত, বয়স্ক পুত্রের তা সমীচীন নাও হতে পারে।"

জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, "এ কি কথা ব'ল্‌ছ ভাই, সত্যব্রতের আমি ভাল পরিচয় পেয়েছি, এরূপ সন্দেহ ক'র্‌লেও তুমি তার উপর অবিচার ক'র্‌বে। তার হাতে আমার ইন্দিরা মাকে দিতে পারলে ভাই, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পারি।"

"তাই নাকি? দেবব্রতবাবু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি ত

আমার পুত্রের জন্য তোমার কন্যাটিকে চাইব ভাবছিলাম, কিন্তু সাহস ক'র্‌তে পারি নি।”

“সে কি ভাই, তুমি আমার একান্ত প্রিয় সুহৃৎ, তোমার অভিলাষও যে আমার কাছে আদেশের চেয়েও বড়। আর সত্যব্রতকে স্বামীরূপে পেলে আমার কন্যাও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে ক'র্‌বে।”

দেবব্রতবাবু বিচলিত হইলেন। গৃহে তাঁহার পত্নী যেরূপ বধূকে মনোনয়ন করিবেন, ইন্দিরা সেরূপ পত্নী হইবার নহে। বর্ত্তমানের রীতি ও নীতি, বর্ত্তমানের চাল-চলন লইয়া পুরাতন আদর্শের মাঝে সে দাঁড়াইতে পারিবে না, একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বিচক্ষণ দেবব্রতবাবু ভাবিলেন, পিতার মত ও আদর্শের ভার পুত্রের উপর চাপাইলে বৈষম্য ও বিরোধেরই সৃষ্টি হইবে ; কোথাও কল্যাণ ও শান্তি হইবে না। কাজেই ইন্দিরাকে পুত্রবধূ করিতে তিনি সম্মত হইয়া বলিলেন, “তোমার বন্ধুপত্নীর কাছে তোমার মেয়ে হয়ত খুব বাঞ্ছনীয় না হতে পারে, সেকেলে গৃহিণী এদের চাল-চলনকে বেয়াড়া মনে ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু পুত্রের মুখ চেয়ে আমার পত্নীর অভিলাষ ক্ষুণ্ণ ক'র্‌তে হবে। কিন্তু সত্যব্রত রাজি হবে ত ? কিংবা তোমার কন্যার ত মত হবে ?”

জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু আহ্লাদে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। প্রথমে যেদিন সত্যব্রতের সহিত দেখা হয়, সেইদিন হইতেই মিঃ গুপ্ত সত্যব্রতকে ইন্দিরার ভাবী বর বলিয়া পছন্দ করেন, আজ বহুদিন পরে সে সাধ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। তিনি বন্ধুর হাত ধরিয়া গদগদকণ্ঠে কহিলেন, “না ভাই, সে আমি নিজে হলপ ক'রে বল্‌তে পারি। আমায় একলাই ত কন্যার পিতামাতার কাজ ক'র্‌তে হয়েছে কি না !”

দেবব্রতবাবু চমকিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "সে কি? কবে তোমার পত্নীবিয়োগ হয়েছে? এ খবর ত কারও কাছে শুনিনি?"

জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু মহামুস্কিলে পড়িলেন। হিরণ্ময়ীর উপর তাঁহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। সেই পাষাণী পত্নীর নিষ্ঠুরতার জন্য আজ তাঁহাকে মহালজ্জায় পড়িতে হইল। সমস্ত ব্যাপার শুনিলে, হয়ত দেবব্রত বাঁকিয়া বসিতে পারেন, আর না বলিলেও তাঁহার মনে দ্বিধা জন্মিতে পারে। নিরুপায় মিঃ গুপ্ত হঠাৎ কি জবাব দিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

দেবব্রতবাবু যেন কি অপরাধ করিয়াছেন, ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কষ্টে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া মিঃ গুপ্ত বলিলেন, "দুঃখের কথা, কিন্তু ভাই তুমি হয়ত বুঝ্‌বে! আমার পত্নীর সহিত আমার মতের মিল নেই। এই জন্মোৎসবের মাঝেই আমি কন্যার ভাবী বর নির্ণয় ক'র্‌ব স্থির ছিল, কিন্তু আমার পত্নী এই সব আধুনিকতা পছন্দ করেন না, তাই তিনি রাগ ক'রে হরিদ্বারে চ'লে গেছেন।"

কেহ অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। দেবব্রতবাবু কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। নব্য ও প্রাচীনের মাঝে দ্বন্দ্ব যে বাঙ্গালীর জীবনে নানা বিপ্লব জাগাইতেছে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন; কিন্তু সে মতান্তর যে জীবনের ক্ষেত্রে এমনভাবে, এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হইতেছে, এ সংবাদ তাঁহার জানা ছিল না। তিনি সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "সময়স্রোতই সর্ব্বগ্রাসী, তোমার বেদনায় আমি সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

কিন্তু পরক্ষণেই মনে সন্দেহ জাগিল। হাজার মনান্তর হউক, কন্যার ভাবী মঙ্গলের জন্য মাতা চিরকালই ব্যাকুল থাকে। এ ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ শুনিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে সত্যব্রত আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। উভয়কে প্রণতি জানাইয়া বিনয়-নম্রস্বরে সে বলিল, "বাবা, মোটর নিয়ে এসেছি।" দেবব্রতবাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি অসাবধানভাবে বলিলেন, "কি বল্‌লে ?"

"মোটর এনেছি বাবা !"

মিঃ গুপ্ত সত্যব্রতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা, এই জন্মোৎসবে আমি ইন্দিরা মায়ের ভাবী স্বামী নির্ব্বাচন ক'র্‌ব, এ আশা আমার অনেক দিন ছিল; তোমার বাবা আমার বাল্যবন্ধু, তাঁর মত পেয়েছি, এখন তোমার মত হ'লেই বাবা আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

সহসা এ কি প্রশ্ন ? সত্যব্রত কি বলিবে, ভাবিয়া পায় না। ইন্দিরাকে সে মনে মনে বহুবার কামনা করিয়াছে। সেই বাঞ্ছিত কল্পতরু এমন করিয়া দেখা দিবে, সে কখনও তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। লজ্জায় ও উৎকণ্ঠায় তাহার সমস্ত কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। পুরুষের পক্ষে এরূপ লজ্জা শোভা পায় না ; সত্যব্রত এ কথা জানিত, কিন্তু নিজের গোপন-মনে যে ভালবাসা আজ প্রকাশ পাইয়া সহস্র চক্ষুর দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। কষ্টে আত্মস্থ হইয়া সে বলিল, "আমি কি ব'ল্‌ব, কাকাবাবু। বাবার যে অভিপ্রায়, আমারও সেই অভিপ্রায়। তাঁর আদেশই আমার শিরোধার্য্য।"

দেবব্রতবাবু মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, বাঙ্গালীর ছেলের

পিতৃভক্তি এখানেই শুধু প্রকাশ পায়। পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাহ'লে তাই হবে ভাই, আমি শীগ্‌গিরই এসে মাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবো।"

সত্যব্রত ও তাহার পিতা চলিয়া গেলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু মনের আনন্দে বহুক্ষণ একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

২১

কাল-বৈশাখীর বিক্ষোভ অন্ধকার রাত্রির মধ্যে থামিয়া বসিল। ঝড় বৃষ্টির দাপট কমিয়া গেল। নরনারায়ণের তবু দেখা নাই। যোগেশ ও ইন্দিরা চালাঘরে বসিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। শঙ্কিত ইন্দিরা যোগেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরনারায়ণবাবু এখনও ফিরছেন না, কি হবে এখন?" যোগেশ কি আশ্বাস দিবে, ভাবিয়া পায় না! নীরবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নরনারায়ণ ফিরিতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধে ক্রমেই সে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছিল। স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঝড়-বৃষ্টিতে নরনারায়ণ কোথায় আশ্রয় লইয়াছে, কে জানে? সে রাত্রিতে সে যে ফিরিতে পারিবে, মনের কোন কোণেই যোগেশ এ দুরাশার স্থান দিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তবু বিপন্নচিত্ত ইন্দিরাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে নিজের মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "ঝড় থেমেছে, এবার হয়ত আসবে।" কত বড় মিথ্যা আশ্বাস—যোগেশ তাহা পরিপূর্ণভাবে অনুভব করিল। কিন্তু সে কি করিবে?

প্রতীক্ষায় সময়ের গতি যেন রুদ্ধ হইয়া যায়। উৎসবে ও আনন্দে ঘড়ির কাঁটা যেন দ্রুত চলে। কোন প্রলোভনেই তাহাকে থামাইয়া

রাখা যায় না; কিন্তু যখন পথ চলিয়া বসিয়া থাকি, ঘড়ি প্রায় তখন যেন হরতাল করিয়া বসিয়া থাকে—কিছুতেই চলিতে চাহে না। মিনিট পাঁচেক পরে ইন্দিরা উতলা হইয়া বলিল, "যোগেশ-দা! নরনারায়ণবাবু বোধ হয় আর ফির্‌তে পার্‌বেন না, ঝড়-জলে কোথায় গিয়ে পড়েছেন কে জানে!"

এ সম্বন্ধে যোগেশের মনেও তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না। সে শুধু রাত্রির কষ্ট প্রভৃতির কথা ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল! ইন্দিরার মনে অন্য ভাবনা চলিতেছিল। একজন তরুণ যুবকের সহিত এরূপভাবে রাত্রিবাস তাহার নিকট কিছুতেই ভাল লাগিতেছিল না। সে নিজের মনে নিজেকেই ধিক্কার দিতেছিল। নরনারায়ণের কথায় ভুলিয়া যদি শিকারে বাহির না হইত, তাহ'লে এ সঙ্কটের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইত না।

এই দুর্দ্দৈবের মধ্যেও কিন্তু যোগেশের মনে দুর্দ্দমনীয় লালসা জাগিয়া উঠিতেছিল। মানুষের মনের আদিম পশু কিছুতেই থামিতে চাহে না; বিশ্বস্তচিত্ত এই তরুণী তাহার আশ্রিতা, এ কথা ভাবিয়া মনে সঙ্কোচ জাগিতেছিল; তথাপি উচ্ছল কামনা তাহার মোহভরা যাদু দিয়া যোগেশের অন্তরে ঝড় বহাইতেছিল। সুন্দরী তরুণীর নিভৃত সাহচর্য্য তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। অতি অন্ধকারেও ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিতেও সাহস হইতে ছিল না। শুধু নীরব রহিলে ভাল দেখাইবে না বলিয়া সে আশ্বাস দিল, "ভয় কি ইন্দিরা, অমি ত আছি"—একথা বলিয়াই সে নিজেই চকিত হইয়া উঠিল। নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে কত বড় মিথ্যাই না বলিয়াছে। তাহার অগোচরে তাহার মনে যে রাক্ষস জাগিতেছিল, সে যে ইন্দিরাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, একথা

সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। অসহায় অবস্থায় মানুষ ভগবানের শরণাপন্ন হয়। মনে করে, বিপদের কালো মেঘ তাঁহার দয়ায় উড়িয়া যাইবে। যোগেশ ভগবানকে মানে না, তাই ভগবানের দয়ার আশ্বাস দিতে পারিল না।

ইন্দিরা আশ্বাসে আশ্বস্ত হইল না। সে শুধু একান্তমনে দৈবের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। সে আশা করিল, হয় ত কোন অসম্ভব উপায়ে এই সঙ্কটের পরিত্রাণ হইবে। অগতির দিনে মানুষ আপনার পৌরুষ ভুলিয়া যায়। অজানার হাতে নিজের ভাগ্যকে ছাড়িয়া দিয়া, একান্তমনে দৈব সুযোগের আশা করে। যোগেশ উসুখুসু করিয়া অনেক্ষণ কাটাইল। রাত্রি বাড়িতেছে দেখিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ইন্দিরা, তুমি খুব ক্লান্ত হয়েছ? আমার জামা-চাদর খুলে পেতে দিচ্ছি, তুমি একটু শুয়ে নাও, আমি বসে পাহারা দিচ্ছি।"

ইন্দিরা রূপকথায় পড়িয়াছিল, রাজপুত্র রাজকন্যাকে রাক্ষসের দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া নিয়া দেশে ফিরিতেছেন, পথে রাজপুত্র তেপান্তরের জঙ্গলে পড়িল। রাত্রে রাজকন্যা ঘুমে অবশ। ছাতিমের তলায় রাজকন্যা অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল। রাজপুত্র জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিল। হঠাৎ রাজপুত্রের পাহারা হইতে ডাইনীবুড়ী রাজকন্যাকে লইয়া পলাইল।

যোগেশের কথা শুনিয়া তাহার মনে এই কথা জাগিল। কি যেন আশঙ্কায় সে উত্তর দিল, "না থাক্ যোগেশ-দা! আমার ঘুম আস্ছে না।"

প্রত্যুত্তরে যোগেশ কি বলিবে, ভাবিয়া পায় না। নিশীথ রাত্রির আগমন ধানের ক্ষেতের ফাঁকে, বনস্পতির শাখায় শাখায়, কি যেন যাদু সঞ্চার করিয়া দেয়। বিস্ময় ও ভয় মনকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে।

এমন সময়ে অঘটন ঘটিল। দূরে আলোর রশ্মি দেখা গেল এবং কিছু পরে জলে ক্ষেপণী-পতনের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা গেল। ইন্দিরা পুলকভরে কহিল, "ঐ বোধ হয় নরনারায়ণবাবু!"

যোগেশ বলিল, "এ অন্য কাহারা, নরনারায়ণের কাছে ত আলো ছিল না।"

ইন্দিরা জবাব দিল, "তা বটে, কিন্তু ওদের ডাক, ওরা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য ক'রবে।"

যোগেশ তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল, "তা ক'রবে বৈ কি? কিছু বখ্‌শিশ্‌ দিলে খুসি হ'য়ে আমাদের লঞ্চে পৌছে দেবে।"

নৌকা কাছে আসিতেই যোগেশ ডাকিল, "কারা যায়?"

ছিদাম ও তাহার ভাগিনেয় কালাচাঁদ জেলে মাছ ধরিতে যাইতেছিল। বিজন অরণ্যের মাঝে, লোকালয়ের বাহিরে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ে চমকিত হইল। চাপা-কণ্ঠে ছিদাম ভাগিনেয়কে বলিল, "ভাগ্‌নে, ব্যাপার কি? নিশুতি রাতে ওঁয়ারা বেরিয়েছেন বোধ হয়।"

ইন্দিরাও এতক্ষণে বাহির হইয়া নদীতীরে যোগেশের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। কালাচাঁদ অন্ধকারে দু'জনের অস্পষ্টমূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে কিয়ৎপরিমাণে ভীত হইল। কিন্তু মামাকে সাহস দিবার জন্য অস্ফুটস্বরে বলিল, "কে?"

যোগেশ ব্যাপার খানিকটা অনুমান করিয়া লইল। স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "ভয় নেই, আমরা বিপদে পড়েছি, খালের মাথায় নদীতে আমাদের জাহাজ আছে, পৌছে দিলে তোমাদের পাঁচ টাকা বখ্‌শিশ্‌ দেব।"

ছিদাম ও কালাচাঁদ কূলে আসিয়া উভয়কে উঠাইয়া লইল। ইন্দিরা

কষ্টে নৌকায় বসিল, কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া চলিল। সে প্রসন্নকণ্ঠে ছিদামকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কোথায় বাড়ী ?"

ছিদাম উৎফুল্ল হইয়া জবাব দিল, "চরকল্মীতে আমাগো বাড়ী মা, বেলাবেলি মাছ ধর্তে বেরিয়েছিনু ; কিন্তু বরাত খারাপ, আজ কিছু জোটে নি, ঝড়-বর্ষায় কেবল নাজেহাল হয়েছি।"

এই সমস্ত গরীব-দুঃখীর দুঃখ-কথা এমনভাবে সে কখনও শোনে নাই, কাজেই খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া সে ছিদামের সমস্ত পারিবারিক কাহিনী সংগ্রহ করিতে বসিল। কিন্তু বেশী কথা হইল না, জেলেডিঙ্গি খুব তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে আসিয়া ভিঁড়িল। সারেঙ্গ্ অগ্রসর হইয়া ইন্দিরাকে ডাকিয়া তুলিয়া লইল। মনিব্যাগ খুলিয়া ইন্দিরা ছিদামের হাতে একখানি দশটাকার নোট ফেলিয়া দিল।

ছিদাম নোট ফিরাইয়া দিতে চাহিয়া বলিল, "না মা, মুই গরীব, কিন্তু কিছু নিতে পার্মু না।"

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল, "আমায় যে তুই এনেছিস্, সেজন্য এ বখ্শিশ্ নয়। তোর উপকার আমার চিরকাল মনে রইবে। এ তোর ছেলেকে কিছু জলপানি দিলুম।"

ছিদাম তথাপি লইতে চাহে না। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া ছিদাম টাকা নিতে রাজী হইল। সারেঙ্গ্ বলিল, "আর বাবুরাও কেউ ফেরেন নি।"

"সে কি ?"

"অপর সকলেও আপনাদের সাথে বেরুলেন, তারপর কেউ ফেরেন নি।"

"এই জেলেডিঙ্গি নিয়ে কি তোমরা খোঁজে বেরুবে?"

সারেঙ্গ্ জবাব দিল, "তাঁরা জল-ঝড়ে কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন।"

ছিদাম বলিল, "মা, আমায় ছেড়ে দিবার আজ্ঞা কর। বাড়ীতে আমার ছেলেপুলে কাঁদ্‌ছে।"

অসম্মত খালাসীকে পাঠাইয়া লাভ নাই, আর ছিদামকে আট্‌কাইয়া রাখা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া ইন্দিরা নিরুপায় হইয়া উপরে চলিয়া গেল।

২২

'ডেকে' যোগেশ ও ইন্দিরা মুখোমুখী হইয়া বসিল। সারাদিনের উত্তেজনায় কাহারও যেন ঘুম আসিতেছিল না। মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, আকাশে চাঁদ বসিয়া আলোর ঝরণা ছিটাইতেছিল। রুদ্রের সহিত শিবের যে অখণ্ড সম্বন্ধ, সেদিনকার সেই বিপ্লবের শেষের মধুর জ্যোৎস্নালোক বিশেষভাবেই বুঝাইয়া দিতেছিল। চাঁদের আলো আসিয়া ইন্দিরার মুখে পড়িয়া সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। যোগেশ মুগ্ধ ও লুব্ধচিত্তে সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানির রূপসুধা পান করিতেছিল।

খানিক পরে তন্দ্রাজড় স্বরে ইন্দিরা বলিল, "কি কুক্ষণেই কাল বেরিয়েছিলাম!" ইন্দিরার এই স্বগতোক্তি যোগেশের কর্ণে যেন পৌঁছিল না। সে আপন অগোচরেই যেন বলিল, "ইন্দিরা, তুমি কি সুন্দর!" প্রশংসা মানুষের অন্তর আর্দ্র করিয়া তুলে। যোগেশের ঐ উক্তি ইন্দিরাকে তাই ক্ষুব্ধ করিল না। সে শুধু পরিহাস করিয়া বলিল, "কি যোগেশ-দা, বৌদির চেয়েও?"

যোগেশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল। ইন্দিরা তাহাকে খোঁচাইয়া বলিল, "কি, কথা ব'লছ না যে যোগেশ-দা!"

যোগেশের মনে এক অজ্ঞাত উন্মাদনা কাজ করিতেছিল, সে তাহার আবেগে বলিল, "না ইন্দিরা, তুমি উপহাস ক'রো না, বিয়ের নিগড়ে আমি বাঁধা পড়েছি, কিন্তু তোমায় কারও চেয়ে কম ভালবাসি নি।"

ইন্দিরার মনে আপন অজ্ঞাতে কামনা হয় ত জাগিতে চাহিতেছিল, পুরুষের সঙ্গ ও স্পর্শের কৌতূহল, নারীচিত্তে যে আবেগ জাগায়, ইন্দিরার সমস্ত চিত্তে তাহার যেন প্লাবন চলিতেছিল। তাহার অন্তরের নীতিবোধ ডাকিয়া বলে, "ওরে, অবোধ! একি করিতেছ? জাগ্রত হও।" ভীত ও ত্রস্ত হইয়া ইন্দিরা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, "ভালবাসার কথা থাক্, আমার এখন বড় ঘুম পাচ্ছে—যাই শুই গে।"

ইন্দিরা শয়ন করিতে চলিল। যোগেশ তাহাকে ক্যাবিনে পৌঁছাইয়া দিতে পিছনে পিছনে চলিল।

দু'জনের মনে তখন ঝড় বহিতেছিল। আজ এমন নিঃসঙ্গভাবে দুটী তরুণ-তরণী মিলিয়াছে। আর কোনদিনও এরূপভাবে এরূপ অবস্থায় পড়ে নাই। নিঃসঙ্গতার মাঝে লালসা বুভুক্ষু হইয়া উঠে, ব্যাকুলতায় গুমরিতে থাকে।

ক্যাবিনে ঢুকিয়া ইন্দিরা শুইয়া পড়িল। যোগেশও পাশের ক্যাবিনে শুইতে চলিল। শুইয়া কাহারও ঘুম আসে না। ইন্দিরা নরনারায়ণ, শীতাংশু প্রভৃতির কথা ভাবিতেছিল, কোথায় কোন্ অবস্থায় তাহারা আছে তাহা ভাবিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল।

যোগেশের মনে যৌবনের লোলুপ ক্ষুধা জাগিতেছিল। পাশে যে তরুণী ঘুমাইয়াছে, সে যেন বেহেস্তের পরীর মত আপন মোহ দিয়া তাহাকে টানিতেছিল। আলো দেখিয়া পতঙ্গ যেমন ধাবিত হয়, যোগেশের সমস্ত মন তেমন ভাবেই ইন্দিরার দিকে ছুটিতেছিল।

ক্ষণিকের জন্য তাহার মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জাগিতেছিল। কিন্তু সর্ব্বাতিশায়ী লালসা সে দ্বিধাকে দাবাইয়া রাখিতেছিল। যোগেশ কিছুতেই যেন আপনাকে সংবরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার সমস্ত সদ্‌বুদ্ধি কামনার চোখ-রাঙানিতে ভীত হইয়া বিদায় লইতেছিল। ঘুমন্ত মানুষ যেমন জাগিয়া নিদ্রিত অবস্থায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, সে যেন তেমনি ভাবে বাহির হইয়া পড়িল।

ষ্টীমারের মধ্যে সকলে তখন নির্ভরনিদ্রায় মগ্ন। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের শেষে সুপ্তির আলিঙ্গনে সকলে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে। বাহিরে নদীজলে চাঁদ আলোর ঝিলিমিলি জাগাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি স্নিগ্ধ ও শান্ত, যোগেশের মনেই কেবল প্রতিরুদ্ধ কামনা অশান্তি ও আবেগ সৃজন করিয়া চলিয়াছে!

যোগেশ আসিয়া ইন্দিরার ক্যাবিনের দরজার হাতল ঘুরাইল। অসাবধানতায় ইন্দিরা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয় নাই। অতি সন্তর্পণে সে দরজা খুলিল। তরুণীর নিঃশ্বাস-সুরভি ভাসিয়া আসে। যোগেশ পাগল হইয়া উঠে। হঠাৎ কি যেন বাধা ভয় দেখায়। সে ভীতচিত্তে পলাইয়া যায়, নিজের ক্যাবিনে গিয়া অনেক সাধ্যসাধনায় ঘুম আনিতে চাহে। ঘুম আসে না, ঘুমকে ডাকিলে সে যেন পালাইয়া যায়। উত্তেজিত মস্তিষ্ক কিছুতেই শীতল হয় না। যোগেশ কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না।

যোগেশ ঘুমন্ত অবস্থায় মনে মনে তর্ক করে। কিসের আশঙ্কা? কিসের লজ্জা? রূপের যে পরিপূর্ণ মধুপাত্রটী পূর্ণ হইয়া আছে, কেন সে তাহাকে একান্তভাবে ভোগ করিবে না? সংসারে যে জোর করিতে জানে, সেই-ই জয় করিতে পারে। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। শুষ্ক বৈরাগ্যের জন্য ত মানুষের জন্ম নয়। রসে ভরপূর এই বিকচ-কমলকে যদি সে বক্ষের মালা না করে, সে শুধু নির্ব্বোধের মত ঠকিয়া বসিবে। সুযোগ আসিয়া তাহাব দ্বারে মেলানি করিতেছে, আর সে শুধু বোকার মত বসিয়া রহিবে?

সে যে জ্যান্ত-মানুষ। তাহার শিরায় শিরায় যৌবনের ডাক মাদকতা জাগায়। জ্যান্ত-মানুষ যাহাতে আনন্দ পায়, সে তাহাতে আনন্দ পাইবে। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিবার মধ্যেই ত পুরুষের পৌরুষ। সে কেন মিথ্যা আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে?

যৌবনের উল্লসিত ছন্দ তাহার রক্তে তাণ্ডব-নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে; উৎসবের আয়োজন প্রকৃতি করিয়াছে। সে কেন জাগিবে না! সমাজ-নীতির অন্তরায়? এ সমাজ-নীতি ত মানুষের হাতে গড়া, মিথ্যা জিনিষ। যাহারা এই কানুন গড়িয়াছে, তাহারাই তাহা ভাঙ্গিয়াছে। কারণ তাহারা জানিত যে, এ আসলে প্রচণ্ড একটা ফাঁকি।

এমনি নানা চিন্তা যোগেশের চিত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে পুনরায় উঠিয়া বসিল। ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া পুনরায় বাহিরে আসিল। জ্যোতিভরা আকাশের নীরবতা, সন্ধ্যার শান্ত দীপশিখার মত মনোরম বোধ হইতেছিল। জোয়ারের জলে নদী কূলে কূলে ভরা। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না-বিমজ্জিত নদীবক্ষটী যেন অপূর্ব্ব দৃশ্য বলিয়া

অনুভূত হইতেছিল। প্রকৃতির এই মৌন আবেদন যোগেশের মনে কোনও রেখাপাত করিল না। কামনার বন্যা তাহার সমস্ত বোধশক্তিকে যেন নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে শুধু অভিভূতের মত চলিতেছিল।

যোগেশ ধীরে ধীরে ইন্দিরার কক্ষে প্রবেশ করিল। বৈকালের সাজ-সজ্জা খুলিবার অবসর পায় নাই, সুসজ্জিতা ইন্দিরাকে ঘুমন্ত অবস্থায়ও অতি মধুর দেখাইতেছিল। যোগেশ মুখ নত করিয়া রক্তকোকনদসন্নিভ তাহার সুকোমল ওষ্ঠপুটে আসক্তির আবেগমাখা চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

ইন্দিরা ঘুমে অবসন্ন, তবু স্পর্শে আধ-ঘুম আধ-জাগরণে সে বলিয়া উঠিল, "কে ?" যোগেশ কথা বলিল না। গাঢ় আলিঙ্গনে ইন্দিরাকে জড়াইয়া ধরিল। ইন্দিরা জাগিয়া উঠিল না। অবসাদের আলস্যে আবার তন্দ্রালস হইয়া পড়িল।

যৌবনের যে পিপাসা পুরুষ ও নারীর মনে মায়াজাল সৃষ্টি করে, সে পিপাসা হয় ত ইন্দিরার মনে জাগিয়াছিল। আধ-জাগরণে, আধ-তন্দ্রায় যেন অজ্ঞাতসারেই সে কামুক বন্ধুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল।

জীব-সৃষ্টির জন্য বিধাতা প্রাণি-চিত্তে যে আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন, তাহার অপরিমেয় শক্তি।...না হইলে হয় ত জীব-সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখা অসম্ভব হইত। সেই আকাঙ্ক্ষা কি ইন্দিরার মনে কাজ করিয়াছিল কে জানে ?

রাত্রি বহিয়া চলে। রাশিচক্র হেলিয়া হেলিয়া ছুটিয়া চলে, নদীর স্রোতও অফুরন্ত গতিতে সমুদ্রে ধাবিত হয়, তাহার মাঝে পৃথিবীর এক নগণ্যতম কোণে লালসার বহ্নি-দাহ চলে। যতক্ষণ অগ্নি জ্বলে, ততক্ষণ

কি যেন পুলক মনকে ভুলাইয়া রাখে। অজ্ঞ তরুণ ও তরুণী ভাবে, পৃথিবীর পরম শান্তি এইখানে।

দৈব অলক্ষ্যে বসিয়া হাসে। পুলকের পিছনে যে কি অন্তর্জ্বালা আছে, কেহ তাহা খতাইয়া দেখে না। স্খলিতজ্যোতিঃ উল্কার মত লালসা কোথায় ছুটিয়া চলিবে, সেই উত্তেজনার মাঝে কেহ তাহা তলাইয়া দেখে না—দেখিতেও চাহে না।

২৩

পরদিন ভোরের আলো জাগিয়াছে। ইন্দিরার ঘুম ভাঙ্গিলেও একটী অপরিসীম ক্লান্তি তাহার সমস্ত অঙ্গকে যেন বিবশ করিয়া রাখিয়াছে। কিছুতেই যেন উঠিতে ইচ্ছা করে না। কি যেন এক গ্লানি তাহাকে পীড়া দিতেছে। মনে হইতেছে, যেন বিড়ম্বিত জীবনে লাঞ্ছনার আর শেষ নাই। অপরিমেয় এ কি বেদনা? ইন্দিরার মনে হইতেছিল ঘুম যদি আর না ভাঙ্গে, পৃথিবীর আলো, হাসি ও গান আর না দেখিতে হয়। অনেক গড়িমসি করিয়া সে উঠিল। স্নান করিয়া কেশবিন্যাস করিতে গিয়া দেখিল, তাহার চোখ দুটী জবাফুলের মত লাল হইয়াছে। সমস্ত শরীরে কি ভীষণ জ্বালা! ইন্দিরার আর যেন বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না।

বাহিরে কলকোলাহল শোনা গেল। শীতাংশুর দল জলিবোট করিয়া ফিরিয়াছে। অমিতা লাফাইতে লাফাইতে উপরে উঠিয়া ডাকিল, "ইন্দিরা-দি, ইন্দিরা-দি!"

ইন্দিরা বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কাল কোথায় হারিয়ে গেছ্‌লে তোমরা ?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা কেন, তোমরা ত গেলে সোজা খাল দিয়ে, আমরা বাঁকা খাল দিয়ে অনেক দূর গিয়েছি, তখন এল ঝড় আর জল। কোন রকমে একটা অশ্বথ গাছের তলায় উঠে দাঁড়িয়ে রইলুম। অনেক পরে একজন চাষী এসে জানাল যে, নিকটে জমিদারীর কাছারী আছে। আমরা সেখানেই রাত কাটিয়েছি। কিন্তু তোমার কি অসুখ করেছে, ইন্দিরা-দি ?"

ইন্দিরা বিষণ্ণমুখে উত্তর দিল, "হুঁা বোন্, কাল জল-ঝড়ে ভিজে শরীরটা ভয়ানক খারাপ হয়েছে।"

প্রাতরাশের সময় হল-ঘরে সকলে পূর্ব্ব রাত্রির বিপদ ও ভয়ের কথা লইয়া পুনরায় আলোচনা করিতেছিল। নরনারায়ণ পৌঁছে নাই, এজন্য সকলেই একটু বিমনা ছিল। বীর্য্যবান্ এই যুবক আপন সরল নিরাড়ম্বর চাপল্য দিয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিল।

শীতাংশু হাসিভরা মুখে বলিল, "যোগেশ, নরনারায়ণের জন্য কয়েকজন খালাসীকে জলিবোট নিয়ে খোঁজে বেরুতে বলো। কোথায় বেচারী পড়ে রয়েছে, কে জানে!" যোগেশ ব্যবস্থা করিতে গেল।

রেখা প্রশ্ন করিল, "নরনারায়ণবাবুকে কাল একলা যেতে দেওয়া তোমার ভাল হয়নি, সই। ভদ্রলোক যদি কোন বিপদে পড়ে থাকেন ?"

ইন্দিরা জবাবদিহির হাত এড়াইবার জন্য শুধু বলিল, "তখন ত ঠিক বুঝিনি।"

ইন্দিরার ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি, বাক্যের কাতরতা নীরেশকে ব্যথিত করিয়া

তুলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি ভয়ানক অসুখ করেছে? আপনাকে খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে।"

ইন্দিরা শুষ্ককণ্ঠে জবাব দেয়, "না, তবে শরীরটা বড় ভাল নেই।"

"আপনার যদি ভাল লাগে, তাহ'লে কাল একটা গান বেঁধেছি সেটা গেয়ে আপনাকে শোনাতে পারি।"

ইন্দিরা সম্মত হইল। নীরেশ তানপুরা ধরিয়া সুর ধরিল :—

আমার চলা, চলা তোমার পানে, তোমার পানে গো,
স্রোতের তানে তানে,
যেমন ক'রে গগন তলে,
পলে পলে তারা চলে,
সুর লোকের গানে।
আমার বলা, বলা তোমার কানে, তোমার কানে গো,
চলার অবসানে।
সুরের লীলা কথার ছলে
চলে চলে জগৎ-চলে
প্রীতির বানে বানে,
আমার চলা, চলা তোমার পানে, তোমার পানে গো,
স্রোতের তানে তানে।

গানের মাধুর্য্য ক্ষণিকের জন্য ইন্দিরাকে তিমির গহ্বর হইতে ডাকিয়া যেন আলোকের যাত্রাপথে দাঁড় করাইয়া দেয়। কিন্তু ক্ষণিক পরেই আবার অবসাদ আসিয়া দেখা দেয়। অদৃশ্য কাঁটার মত গত রাত্রির কথা তীক্ষ্ণ হইয়া বিঁধিতে থাকে।

নরনারায়ণ আসিয়া পৌছিল। তাহার সঙ্গে একটী মৃত কুমীর। নরনারায়ণ আসা মাত্রই সকলেই যুগপৎ বাক্যবাণে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। ইন্দিরার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সে বলিল, "আপনাকে ওরূপ অবস্থায় রেখে যাওয়া আমার ভয়ানক ভুল হয়েছিল। কিন্তু এমন হবে, তা আমি কিছুতেই অনুমান ক'র্‌তে পারিনি।"

ইন্দিরা কোন উত্তর করিল না। নরনারায়ণ ভাবিল ইন্দিরা রুষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাই সে কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। লজ্জায় পাংশুমুখ হইয়া বলে, "কুমীরটা আমায় ভয়ানক ভুগিয়েছে। জল-ঝড়ের মধ্যেও ওর পিছনে পাঁচ-ছয় মাইল রাস্তা আমার ছুটতে হয়েছে।"

একজন খালাসী কুমীরটাকে উপরে আনিয়াছিল। সকলেই তখন কুমীর দেখিতে মত্ত হইয়া উঠিল।

নরনারায়ণ আসার পরেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। কলিকাতায় ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন আর কোন মজলিশ জমিতেছিল না। ইন্দিরা অসুখের কথা বলিয়া নিজের ক্যাবিনে গিয়া শুইয়া পড়িল। যোগেশও নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখিতে চায়। কিন্তু লোকের কাছে তাহা ধরা না পড়িয়া যায়, এরূপভাব দেখাইতে লাগিল। নরনারায়ণের বিজয়-গৌরবে সকলের বিশেষ উৎসাহ দেখিতে না পাইয়া সেও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল এবং একখানি শিকারের বই লইয়া পড়িতে বসিল।

ইন্দিরার শয্যায় ঘুম পাইতেছিল না। ভালও লাগিতেছিল না। কণ্টকশয্যায় সে যেন ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিতেছে। অমিতা আসিয়া

পাশে বসিল। ইন্দিরা তাহাকে বলিল, "লক্ষ্মী বোন, আমার মাথায় একটু 'অডিকোলন' দিয়ে দেবে ?"

অমিতা অডিকোলন দিতে দিতে গল্প সুরু করিল। বিহগ-কাকলীর মত অমিতার মনের নানা কথা ইন্দিরার ভাল লাগিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এমনি একটা স্নিগ্ধ-শান্ত নিরুপম মন লইয়া জীবনে চলিতে কি আনন্দ! কথায় কথায় নীরেশের কথা উঠিল। অমিতা বলিল, "নীরেশবাবু বেশ লোক, না ইন্দিরা-দি ? ওঁর গান আমার খুব ভাল লাগে, ওঁর কাছে যদি গান শিখ্‌তে পার্‌তুম !"

ইন্দিরা লক্ষ্য করিল, অমিতার মুখে কোন কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা নাই। ব্রীড়ামধুর চাতুরী নাই। নীরেশকে অমিতা হয় ত ভালবাসিয়াছে। এই অনুমান করিয়া ইন্দিরা কৌতুক করিয়া বলিল, "তা ওকে তুই তোর প্রেমের ফাঁদে বেঁধে ফেল্ না" মনের বেদনাকে সে কৌতুক করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে। লজ্জায় অমিতার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার সুকোমল মনের অন্তরে যাহা গোপনে ফুটিতেছিল, ইন্দিরার কথায় তাহার অপ্রত্যাশিত আভাস দেখিয়া সে যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। সে শুধু এই কৌতুককে রূঢ় মনে করিয়া চেষ্টা করিয়া বলিল, "যান্ ইন্দিরা-দি, আপনি ভয়ানক দুষ্টু।"

"দুষ্টু কি রে, তোদের দুটিতে ত বেশ মানায়।"

অমিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ইন্দিরা-দি তুমি অমন ক'র্‌লে আমি পালিয়ে যাচ্ছি।"

"কি যে পাগ্‌লী, আমি একটু কৌতুক কর্‌ছি, তাই নিয়ে—"

কথা শেষ করিতে হইল না। অমিতা লজ্জা-মৌন হইয়া প্রস্থান করিল।

কক্ষের মৌনতা ইন্দিরার অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আড়ষ্টভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। তন্দ্রাঘোরে সে ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখনও নরকের মাঝে তপ্তলৌহে তাহাকে যেন দগ্ধ করা হইতেছে। কখনও বা তাহাকে শত সহস্র যন্ত্রণাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত করা হইতেছে। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ইন্দিরা জাগিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বশরীর দিয়া দর-দর ধারে ঘাম ছুটিতেছিল।

ইন্দিরা দুপুরে কিছুই আহার করিল না। বিকালের দিকে রেখা আসিল।

রেখা বলিল, "সই, এখন কেমন আছ ?"

কাতরতা ভুলিয়া ইন্দিরা বলিল, "ভাল আছি।"

ইন্দিরার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রেখা লজ্জাজড়িত স্বরে বলিল, "একটা কথা ব'ল্‌ব, সই ?"

ইন্দিরা উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কি বোন ?"

ব্রীড়ারঞ্জিত আননে রেখা উত্তর দিল, "তিনি আমার মত চেয়েছেন। আমি কি ব'ল্‌ব, বল না ?"

সলাজ-দৃষ্টি ইন্দিরা মুখে প্রসন্নতার হাসি আনিয়া বলিয়া উঠিল, "এতে আর লজ্জার কি আছে ? তোর মন যদি তৈরি হয়ে থাকে, মত দিয়ে দে।"

রেখা কি বলিবে, বুঝিয়া পায় না। নীরবে নখ খুঁটিতে থাকে। ইন্দিরা কৌতুক করিয়া বলে, "শুভস্য শীঘ্রম্ সই", শাস্ত্রবাণী মানতে হয়। এখানে শাঁখ্ নেই, নইলে আমি বাজিয়ে তোমার এই মধুমিলনের জয় ঘোষণা ক'র্‌তুম্।"

"কিন্তু আমি কি ওর যোগ্য হ'তে পার্‌বো? ওর ভালবাসা যখন দুর্লভ ছিল, তখন আমার তার প্রতি লোভ ছিল। আজ যখন তা হাতের কাছে, তখন নিতে ভয় হচ্ছে। যদি ভুল ক'রে থাকি, যদি ওর যোগ্য না হই!"

ইন্দিরা রেখার চিবুক নাড়িয়া দিয়া আহ্লাদ করিয়া বলিল, "হয়েছে সই, এখন আর বক্তিমে নয়। তুই একবার চুপটী ক'রে বসে থাক্। আমি তোর আত্মভোলা নববধূমূর্ত্তিকে ভাল ক'রে দেখে নেই।"

রেখা সখীর উচ্ছ্বাস দেখিয়া যুগপৎ তৃপ্ত ও লজ্জিত হইল। রেখা যে তাহার বরকে কাড়িয়া লইতেছে, এজন্য কি ইন্দিরার কোন দুঃখ নাই? সম্ভ্রম ও সরমে রেখার মাধুরী ইন্দিরার নিকট নূতন বলিয়া মনে হইল। সে কলকৌতুকের উল্লাসে বলিল, "তোর এই সমাহিত আত্মদান দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি সই। মকরকেতন তাব পুষ্পধনুর কাজ বেশ জোর হাতে চালাচ্ছেন। অমিতাও নীরেশের প্রেমে পড়েছে। তাদের মিলনটাও এই সাথে হয়ে যাক্।"

রেখা ত্রস্ত হইয়া বলিল, "কে বলেছে, সই? আমার পিসেমশাই সহজ লোক নন্। কন্যা প্রেমে পড়েছে শুন্‌লে তিনি বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠ্‌বেন। তাঁর চেয়ে যোগ্যপাত্র ব'লে নীরেশবাবুর পরিচয় জানিয়ে দিলে কাজ হবে।"

"অমিতা মেয়েটীকে আমার বড় ভাল লাগে। পদ্মপত্রে বর্ষাবিন্দুব মত যেন শুভ্র, নির্ম্মল, প্রশান্ত। আত্মসংবরণ নেই অথচ উচ্ছ্বাস অন্তরে গিয়ে গভীর নাড়া দেয়। নীরেশবাবুর সঙ্গীত-লক্ষ্মী হ'লে ওকে সত্যিই মানাবে।"

রেখা বলিল, "সবার বিয়ের ত বন্দোবস্ত ক'র্‌ছ, সই। কিন্তু নিজের কি ক'র্‌ছ? কথায় বলে, দৈবজ্ঞ অপরের ফাঁড়া গণে, নিজের ফাঁড়া গণে না।"

ইন্দিরার মুখ পাংশু হইয়া গেল। রেখার এই ব্যঙ্গ তাহার অন্তরের অন্তরে তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত গিয়া বিঁধিল। কৌতুকের মাঝে যাহাকে সে লুকাইতে চাহে, সেই লজ্জা আবার ব্যথা-বিষে জাগিয়া ওঠে। তাহার পিতা হয় ত এতক্ষণে সত্যব্রতের সহিত তাহার পরিণয় স্থির করিয়াছেন, কিন্তু অশুচি দেহ ও মন লইয়া সে কেমন করিয়া সত্যব্রতকে পতিত্বে বরণ করিবে?

রেখা বিস্মিত হইয়া গেল। সখীর অকস্মাৎ রোষের কোন কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না।

কলিকাতার নিকট ষ্টীমার আসিয়া পড়িয়াছিল। দূর হইতে নানা বর্ণের মাস্তুল দেখা যাইতেছিল। অন্য কথা পাড়িবার জন্য রেখা তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আমরা ত এসে পড়েছি, সই। ঐ ত ক'ল্‌কাতা দেখা যাচ্ছে।"

ইন্দিরা তথাপি কথার প্রত্যুত্তর দেয় না। রেখা ভয়ানক মুস্কিলে পড়িয়া গেল। অপ্রস্তুত রেখা তখন বলিল, "না ভাই, আমি ক্ষমা চাইছি।" তোর মনে যদি কোন ব্যথা দিয়ে থাকি, আমায় মাপ কর্‌। আত্মসংবরণ করিয়া এবং কষ্টে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া ইন্দিরা বলিল, না সই, তোর ত কোন দোষ হয় নি। তোর কথায় আমার মনে একটা ভয় হয়েছিল, তাই অন্যমনা হয়ে পড়েছিলুম। সেদিন একটা বই পড়্‌ছিলুম, তাতে লেখক দেখিয়েছেন একটা মেয়ে আপ্রাণ তার স্বামীকে

ভালবেসেছিল। কিন্তু প্রতিদান কোনদিন না পেয়ে সে স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া জনহিতকর কাজ ক'রে জীবনে সার্থকতা লাভ ক'রলে। আমি ত তাই ভাবি ভাই, নিজেদের বেলায় যদি এমন হয়—তার চেয়ে বরং কুমারী-জীবন যাপন ক'রলেই ভাল হয়। মানুষের কল্যাণ ক'রে সুন্দর ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করাই হয় ত শ্রেয়।

রেখা বিস্ময়ে অবাক হইয়া সখীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় সুলেখা আসিয়া জানাইল, "নীরেশ হল-ঘরে গান গাহিবে। সেখানে সকলকে যেতে অনুরোধ করেছে।"

ইন্দিরা বলিল, "অমিতা কই ?"

সুলেখা উত্তর দিল, "তোমাদের ডাক্‌তে তাকে পাঠাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই আস্‌বে না।"

সুলেখা ও রেখা দৃষ্টি বিনিময় করিয়া চাপা-হাসি হাসিয়া লইল।

২৪

অনেকদিন পরে সত্যব্রত কারখানায় চলিয়াছে। তাহার মনে উল্লাস ধরিতেছিল না। পৃথিবী তাহার দুর্নিবার গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। মানুষের মনই তাহার মধ্যে আপন মানসিক অবস্থা অনুসারে মাধুর্য্য বা কদর্য্যতা গড়াইয়া তোলে। নীল আকাশে নীলিম মেঘমালা, সূর্য্য-কিরণে বিশ্ব সমুজ্জ্বল ! পথগুলি লোকে লোকারণ্য। সত্যব্রত দাঁড়াইয়া জনতার গতি দেখিতেছিল। কত লোকের কত সাজ, কত জনের কত ভঙ্গী, কত জনের কত দুর্ব্বলতা, সকলই আজ তাহার চক্ষে অতীব প্রিয় লাগিতেছিল।

জীবনের চলস্রোত

মানুষের চলাচল এবং কলকোলাহল এমন করিয়া আর কোনও দিন ভাল লাগে নাই। রাস্তায় কয়েকটি হিন্দুস্থানী ছেলে ঘুড়ি উড়াইতেছিল। একটি ছেলে অপর ঘুড়িকে টক্কর দিতে যাইয়া তাল সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার ঘুড়িও শূন্যে কাটিয়া শূন্যে উড়িয়া পাড়ার কোন বাড়ীর ছাদে গিয়া পড়িল। ক্রন্দনরত সেই ছেলেটিকে সত্যব্রত কোলে তুলিয়া লইল এবং একটি ঘুড়ির দোকানে গিয়া ঘুড়ি কিনিয়া দিল।

সত্যব্রতের মনে, সোডা খুলিলে বোতল যেমন ফস্ ফস্ করিয়া ওঠে, তেমনি একটা আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে মনের আনন্দে শিস্ দিতে লাগিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, এমন একটা আনন্দের দিনে সে নমিতাকে কিছু উপহার দিবে। প্রিয়জনকে তাহার আনন্দের অংশ না দিলে সে যেন সুখী হইতেছিল না। সে মনে করিল, নমিতার জন্য একখানি পুস্তক কিনিয়া লইবে। পুস্তকের দোকান অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তথাপি প্রায় আধ মাইল রাস্তা ফিরিয়া সে পুস্তক কিনিতে চলিল।

দোকানটি ছোট। সব রকমের বই সেখানে নাই। সত্যব্রত বিরক্ত হইয়া উঠিল। দোকানদারকে বলিল, "আপনার খুব ভালরকম কোন বই নেই, যা' কোন প্রিয়জনকে দিলে মনে খুব তৃপ্তি হ'তে পারে।"

দোকানদার বুড়া মানুষ। সত্যব্রতের আনন্দভাস্বর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "বাবু, প্রীতি-উপহারের মূল্য প্রীতি; তা' থাকলে, যা' দেন তাই বহুমূল্য হয়ে উঠবে।"

সত্যব্রত মহা খুসী হইয়া উঠিল। পরে দোকানদারকে খুসী করিবার

জন্য দুই-তিনখান্ বই পছন্দ করিয়া কিনিয়া লইল। দোকানদার মহা খুশী হইয়া নমস্কার করিল। প্রতিনমস্কার করিয়া ফিরিবার মুখে সত্যব্রত জানাইল, "ভাল বই কিছু আনাবেন। মাঝে মাঝে দরকার মত আপনার এখান থেকেই নেব।"

বৃদ্ধ সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যুত্তর দিল, "বাবু আপনারা দয়া কর্‌লে ত আন্‌তে পারি।"

সত্যব্রত দোকানের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আন্‌বেন। আপনাকে মিথ্যে স্তোক্ দিয়ে ভুলাচ্ছি না।"

সত্যব্রত চলিতে লাগিল। পৃথিবীতে মানুষকে আমরা কত ভালবাসি, মানুষের প্রয়োজন আমাদের কত বেশী, সেকথা আমরা প্রতিদিনই ভুলিয়া যাই। একটী কুলি ঝাঁকা মাথায় চলিতেছিল। পথ-চলা পথিকের ধাক্কা খাইয়া সে সত্যব্রতের গায়ে আসিয়া পড়িল। অন্যদিন হইলে সে এরূপ অবস্থায় অন্ততঃ অসন্তুষ্ট হইতে পারিত। কিন্তু আজ সে কুলিকে কিছুই বলিল না। কুলি যখন মিনতি জানাইয়া বলিল, "মাপ কিজিয়ে বাবু সাব্।"

সত্যব্রত তাহাকে আত্মীয় করিবার জন্য বলিল, "কুছ্‌নেই হুয়া ভাইয়া।"

কুলি এরূপ সদয় ব্যবহার খুব কমই পাইয়া থাকে। সকলের বিদ্রূপ ও ঘৃণাই তাহার অঙ্গের ভূষণ। কুলি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া বলিল, "সেলাম বাবু সাব্।"

সত্যব্রত তাহার ঝাঁকাতে পুস্তকের বাণ্ডিলটা দিয়া বলিল, "চলিয়ে হামারা সাথ্।"

আশার কুহক কি বিরাট শক্তিসম্পন্ন। দৈন্য, দুঃখ, ব্যথার মাঝে

আশাই একমাত্র সম্বল। সিদ্ধির চেয়ে, সার্থকতার চেয়ে আশার প্রয়োজন ও মাধুর্য্য বেশী। যাহা পাইয়াছি সে তাহার ক্ষুদ্রতা দিয়া ক্লিষ্ট করে। অপ্রাপ্য তাহার মোহন-মোহ দিয়া চিরদিনই অন্তর ভুলায়। আশার এই চিরন্তন মায়া লইয়াই ত জগৎ চলিতেছে।

সত্যব্রত ভাবিল, নমিতাকে সে একদিন ভালবাসিয়াছিল, নমিতাই তাহার জীবনে প্রেমের কুসুম সঞ্চার করিয়াছে। আজ তাহার জীবনের এই পরম আনন্দময় সমাচার দিবার সময় তাহাকেই সে প্রথম স্মরণ করিবে। সম্মুখে একটী জহরতের দোকান দেখিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল।

বন্দুকধারী দারোয়ান উঠিয়া সেলাম জানাইল। দোকানের মালিক অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল, "বসুন, আপনার কি চাই, বলুন।"

সত্যব্রত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। দোকানে কি কিনিবে ভাবিয়া ঠিক করে নাই। কি ফরমাস্ করিবে, সে সহসা বলিতে পারিল না। দোকানী পাকা লোক। সমস্ত ব্যাপার অনুমান করিয়া বলিল, "বাবু, আপনার পরিবারের জন্যই বুঝি? জগদীশ, আমাদের একটা ক্যাটালগ্ নিয়ে এস ত। দেখুন হালফ্যাসানের সমস্ত রকম জিনিষই এখানে মেলে। ইচ্ছা হ'লে সবাইকে সঙ্গে ক'রে এনে পছন্দ ক'রে নিয়ে যেতে পারেন।"

সত্যব্রত বলিল, "না, সে রকম কিছু নয়। আমার কোন আত্মীয়াকে কম দামের কিছু উপহার দিতে চাই।"

"তা বেশ, আপনার যেমন অভিরুচি। ওরে জগদীশ, বাবুকে আংটী, ব্রোচ্, সেফ্টী-পিন প্রভৃতি দেখা।"

সত্যব্রত অনেক দেখিয়া শুনিয়া একটী ব্রোচ্ পছন্দ করিয়া লইল।

কারখানায় পৌঁছিতে বেলা পড়িয়া গেল। কারখানার সমস্ত তদারক করিয়া সে অবশেষে নমিতার নিকট গেল। অন্যদিন কাজে যাহার ত্রুটি হইত, সে সত্যব্রতের নিকট ভর্ৎসনা লাভ করিত।

সত্যব্রত বলিত, "বাঙ্গালীরা কাজে ফাঁকি দিতে চায়। মিষ্টকথা ব'ল্‌লে কাজ আদায় করা চলে না। আদর দিলেই তারা মাথায় ওঠে। অনুগ্রহের মর্য্যাদা তারা জানে না। তাদের তাই কড়া শাসন দরকার।"

আজ কিন্তু সে দিল্‌দরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সকলকে আদর করিয়া, সকলের কাজ ভালভাবে বুঝাইয়া, সে যখন নমিতার নিকট গেল, তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

নমিতা তাহাকে বসিতে আসন দিয়া বলিল, "একটু চা ক'রে দেব ভাই?"

সত্যব্রত আগ্রহভরে উত্তর দেয়, "দাও দিদি, আজ বড্ড ঘুরেছি, খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার আনানো যাক্।"

নমিতা অসম্মতি জানাইয়া বলিল, "বাজারের খাবার কেন? আমি না হয় তাড়াতাড়ি দু'খানা লুচি ভেজে দিচ্ছি।"

"না, তার দরকার নেই। বাজারের খাবাব না হ'লে ত আমাদের দিন চলে না। আসুক না-হয় কিছু?"

নমিতা কৌতুক করিয়া বলে, "বাজারের খাবার যাতে আর না আন্‌তে হয়, তার ব্যবস্থা ক'র্‌লেই হয়।"

হাসিতে হাসিতে সত্যব্রত বলিল, "সে আর হবার কি যো আছে দিদি! তোমরা যে আজকাল হাতাবেড়ী ফেলে রণ-রঙ্গিনী হয়ে উঠেছ।"

নমিতা চাপা-হাসি হাসিয়া বলিল, "তা বটে, সেই ভয়েই আইবুড়ো হয়ে বসে থাকা নেহাৎ বেকুবি হবে।"

"বেকুবি বটে। কথায় বলে ও জিনিষটা দিল্লীর লাড্ডু। যে খেয়েছে সে পস্তিয়েছে, যে না খেয়েছে সেও পস্তিয়েছে।"

নমিতা সত্যব্রতের নিঃসঙ্কোচ লঘুতা দেখিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইল। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কি ভাই, দিল্লীর লাড্ডু খেতে যে বড্ড উৎসুক হয়েছ?"

"পস্তাতে পারি দিদি। যদি তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখ?"

নমিতা শঙ্কিত হইয়া ওঠে। যে বন্যা একদিন ডাকিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়াছে কি না কে জানে? ব্যাকুল অধীরতায় তাই জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই?"

সত্যব্রত দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "তা বল্‌ছি না। আগে তুমি স্বীকার করো।"

"বাঃ, এ ত ভারি মজা। আমি না জেনে শুনে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে থাকি, আর শেষে তুমি আমায় সাপ, ব্যাঙ খেতে বল আর কি?"

সত্যব্রত ক্ষোভের ভান করিয়া বলে, "এই তুমি আমায় চিনেছ দিদি! বেশ, তাই যদি তোমার মনে হয়, আমি চলে যাচ্ছি, আর কখনও জ্বালাতন ক'র্‌তে আস্‌বো না।"

"কি যে পাগল তুমি। কিন্তু না জেনে প্রতিজ্ঞা করা—"

কথা কাড়িয়া লইয়া সত্যব্রত বলিল, "ব'ল্‌তে চাইছ মহাপাপ? বেশ আমি পাজী, নচ্ছার, জুয়োচ্চোর, আমায় বিশ্বাস ক'রো না। আমি এই চল্‌লুম।"

নমিতা উত্তর দিতে পারিত, বলিতে পারিত, "বিশ্বাস কি ? তুমি ত একদিন স্বেচ্ছান্যস্ত ভারের অপমান ক'র্‌তে গিয়েছিলে !" সে ইঙ্গিতের ধার দিয়ে না গিয়েও সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "পাগল আর বলে কাকে ? যেয়ো না ভাই, বসো।"

"তাহ'লে অনুরোধ রাখ্‌বে, ব'ল্‌ছ ?"

"আচ্ছা !"

সত্যব্রত তখন গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাহ'লে দিদি এইবার তুমি চোখ বোজো।"

"সে কি, আমি চোখ বুজ্‌তে পার্‌বো না। চোখ বুজ্‌লে আমার মনে হয়, আমি যেন ম'রে গেছি।"

"আবার ?"

"নাও নাও, তুমি ত ভারী দুষ্টু। তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই।"

"বেশ, এইবার হাত দু'খানি বাড়িয়ে পেতে ধরো ত দিদি।"

"সে কি ? না না, আমি চোখ খুলে ফেল্‌লাম্।"

সত্যব্রত রাগতভাবে বলিল, "বেশ, আমি তাহ'লে চলে যাই ?"

"আচ্ছা নাও নাও, এই হাত বাড়িয়েছি।"

সত্যব্রত তখন নমিতার হাতে পুস্তকের প্যাকেট ও ব্রোচের কৌটা দিয়া দিল।

চোখ মেলিয়া নমিতা রাগিবে না হাসিবে, বুঝিতে পারিল না। সে বিস্মিতদৃষ্টি মেলিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, "এ কি ভাই ?"

সত্যব্রত নমিতাকে অবাক্ করিবার জন্য তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "বল ত দিদি কি ?"

নমিতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। টেবিলের ’পরে নামাইয়া বইয়ের পাতা খুলিয়া দেখে। কৌটা খুলিয়া মণিখচিত ব্রোচের পানে চাহিয়া রহে। পরে ধীরে ধীরে বলে, “তোমার ভালবাসা অতি দুর্লভ জিনিষ ভাই, কিন্তু—”

বাধা দিয়া সত্যব্রত বলিল, “ভয় নেই দিদি, এ তোমায় ভুলোতে দেইনি। অন্যায় করেছিলাম বটে, কিন্তু অন্যায় শুধরোতে জানি। তোমার ভাইয়ের বিয়ের দিনে তোমার ভাই যদি কিছু দিত, তা কি তুমি নিতে না দিদি?”

“তা নিতুম বৈ কি, কিন্তু ব্যাপার কি? আমায় বলনা ভাই।”

সত্যব্রত তখন সমস্ত কথা বলিল। নমিতা মনোযোগ দিয়া বিবাহের সমস্ত কথা শুনিল। মনের অগোচরে হয় ত অবচেতনচিত্তে বেদনার কাঁটা বিদ্যুতের শিখার মত খানিক গভীর জ্বালা দিয়া মিলাইয়া গেল। পরে হাসিতে হাসিতে বলিল, “শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে! আমি ভগবানের নিকট একান্তমনে কামনা করি, তোমাদের জীবন প্রেমে ভ’রে উঠুক্।”

বিধাতাপুরুষ যদি কেহ থাকেন, তখন অলক্ষ্যে বসিয়া হয় ত হাসিয়াছিলেন। বালু-তটে আমরা যে কল্পনার ধূলির প্রাসাদ গড়ি, সে যে নিমেষের অপেক্ষা রাখে না, একথা আমরা একবারও তলাইয়া ভাবিয়া দেখি না। নমিতার নিকট সত্যব্রত যখন আপন ভাবী বিবাহিত জীবনের প্রিয়াসঙ্গমধুর ভাববিলাসের কল্পনা করিতেছিল, ষ্টীমারে তখন ইন্দিরা একক জীবন যাপনের মতলব আঁটিতেছিল। ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা।

নমিতা খানিক পরে বলিল, “তাহ’লে ভাই, তোমার আজ এখানে

খেতে হবে। আইবুড়ো ভাত না খেলে যে তোমার বিয়ের ফুল ফুটবে না। যাই আমি মাকে জানিয়ে আসি।"

সত্যব্রতের তাহাতে আপত্তি ছিল না। আজ যে যাহা প্রার্থনা করুক, তাহাই দিতে সে প্রস্তুত আছে।

নমিতার শাশুড়ী আসিয়া জানাইল, "বাছা, শুনে বড়ই খুসী হলেম। আমার মাথায় যত চুল, তোমার তত পেমাই হোক্। তা বাবা বউ কেমন হয়েছে? মনের মত হয়েছে ত? রাঙা টুকটুকে একটী বউ না হ'লে কি ঘর মানায়?"

সত্যব্রত এতগুলি প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পায় না। বৃদ্ধার আনন্দোচ্ছ্বাস সংযত না করিলে মুস্কিল। কিন্তু উপায় না দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বয়স ত ঠিক জানিনে, তবে আজকালকার মেয়েদের ত আর ছোট বয়সে বিয়ে হয় না।"

"তা ত ঠিকই বাবা। আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন আমি ভাল ক'রে কথা ব'ল্‌তে শিখিনি। আমার উনি আর আমি দু'জনে সারাদিন লুকোচুরি খেলে বেড়াতাম।"

স্মৃতির লুকানো পাতা খুলিয়া যায়। অতীতের আনন্দভরা দিনের কথা বৃদ্ধার মনকে বিষন্ন করিয়া তুলে।

নমিতা আসিয়া বলে, "মা, সত্যব্রতবাবুকে এখানে খেতে বলেছি।"

বুড়ী বলিল, "সে ত বেশ হয়েছে মা। বেশ ত, আমি পিঠে রেঁধে খাওয়াব'খন।"

"না মা, তা ক'রতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে, তার চেয়ে বরং আপনি একটু পায়স রান্না করুন।"

"বেশ বেশ, পরমান্ন হ'লেই হ'ল। চল মা রাত হয়েছে। তাড়তাড়ি না ক'র্‌লে পারা যাবে না।"

সত্যব্রত এই স্নেহ ও প্রীতির অগাধ সমুদ্রে ডুবিয়া দেখিতেছিল। স্বপ্ন-দোলায় চড়িয়া সে পরিণীত জীবনের পরম রমণীয় একখানি চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিতেছিল।

২৫

ষ্টীমার আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু ঘাটে আসেন নাই, কারণ আসিবার সময়ের স্থিরতা ছিল না। শীতাংশু, রেখা, সুলেখা ও সুব্রত এক মোটরে চাপিয়া বসিল। যোগেশ আজ সারাদিন পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছিল। সে নীরেশকে বলিল, "ভাই, আমি বড় ব্যস্ত আছি, তুমি ইন্দিরাকে বাড়ী পৌঁছে দাও না।"

নীরেশ সহজে সম্মত হইল। নীরেশ, অমিতা ও ইন্দিরা একত্র চলিল। যোগেশ দু' পা হাঁটিয়া ট্রাম ধরিয়া ঘরে ফিরিল। নরনারায়ণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সারা পথে তখন বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিতেছিল। ইডেন-গার্ডেনে সুখপ্রয়াসী পথিকের যাত্রা থামিয়া গিয়াছে। অল্প কয়েকজন লোক এদিকে ওদিকে চলাফেরা করিতেছিল। দুই দিনের পরে কলিকাতায় ফিরিয়াছে, তবু চিরপরিচিত কলিকাতার মূর্ত্তি মধুর হইয়া দেখা দেয়। বাংলাদেশের শস্য-শ্যামল কমনীয় রূপশ্রী দেখিবার পরে আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর দৃশ্য তাহার বৈপরীত্যে ইন্দিরার মন ভুলাইতেছিল।

গড়ের মাঠের মধ্যে মোটর চলিল, দূরে চৌরঙ্গীর সৌধশ্রেণী তাহার নয়ন-ভুলানো আলোকমালা লইয়া যেন এক স্বপ্নপুরীর মত মনে হইতেছিল। সকলেই নীরবে অন্যমনস্কভাবে চলিয়াছিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নীরেশ বলিল, "এ যাত্রা আমাদের খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু আপনি অসুস্থ হয়ে ফির্‌ছেন, এই যা দুঃখ।"

ইন্দিরা উত্তর দিল, "দুঃখ-সুখের নাগর-দোলা অনবরত ঘুর্‌ছে, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। আর আমি ত অনেক ভাল হয়ে উঠেছি। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে—একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম।"

অমিতা বলিল, "ইন্দিরা-দি, কি চমৎকার! নদীর চলার এত যে রূপ, এতদিন তা জানতুম না। বাইরে না গেলে এমন ক'রে বাংলা মায়ের রাজশ্রী দেখা হ'ত না।"

ইন্দিরা বলিল, "তা ঠিক, আমি দুঃখ পেলেও তোমরা যে সুখ পেয়েছ, এতেই আমি নিজেকে সার্থক মনে কর্‌ছি। ভালবাসার যে বাঁধন রেখা ও শীতাংশুবাবুকে একত্র করেছে, সে বাঁধন জয়যুক্ত হোক্।"

অমিতা অপ্রতিভ হইয়া চাহিয়া রহে। ইন্দিরা হেঁয়ালি করিয়া কি বলিতে চাহে? লজ্জায় লাল হইয়া সে মাঠের পানে চাহিয়া রহে।

রাত্রির স্তব্ধ তারাখচিত আকাশ উপরে জ্বলে। শান্ত-স্নিগ্ধ হাওয়ায় কি মাদকতা আনে! নীরেশও ইন্দিরার কথা ধরিতে পারে না; সে বুঝিয়া পায় না, এ সহানুভূতি না ঈর্ষ্যা। শীতাংশু ও ইন্দিরার মধ্যে যে সৌহৃদ্যের নিবিড়তা ছিল, একথা সে জানিত।

গাড়ী আসিয়া 'চেরী-ভিলায়' দাঁড়ায়। সকলে নামিয়া হল-ঘরে চলিল, জ্যোতিঃপ্রসাদবাবু কন্যার আগমন-সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত-সমস্ত

হইয়া অগ্রসর হইয়া কন্যাকে লইয়া চলিলেন। কন্যার বেদনানত পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া পিতার মনে উদ্বেগ জন্মিল। তিনি আকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোনও অসুখ করেছে, মা?"

ইন্দিরা নিজেকে যথাসম্ভব প্রফুল্ল দেখাইবার ভান করিয়া বলে, "না বাবা, আমি ভাল আছি। সামান্য একটু শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই মুখটা শুক্‌নো দেখাচ্ছে।"

পিতা আশ্বস্ত হইলেন। মিঃ গুপ্ত আশা করিয়াছিলেন যে, দলের সকলেই তাঁহার বাড়ীতে আসিবে এবং সকলের সম্মুখে তিনি আনন্দসংবাদ জ্ঞাপন করিবেন। অপর কাহাকেও না দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর সব কোথায় গেল?"

তাঁহার কথার ভঙ্গী ও স্বরে অন্তর্নিহিত অসন্তোষ প্রকাশ পাইল। নীরেশ ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া উত্তর দিল, "দু'তিন দিন বাইরে থেকে, সবার মনে বাড়ী ফেরার ইচ্ছে খুব প্রবল হয়েছিল ব'লে, তারা সব বাড়ী ফিরে গেছে।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ মাথা নাড়িয়া অসন্তুষ্টি জানাইয়া বলিলেন, "তা কেন? এখানে একত্র এসে যে যার বাড়ী গেলেই ভাল হ'ত।"

তারপর বক্তার ব্যগ্রকণ্ঠের উপর সকলে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিল। কন্যার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, এ শুভসংবাদ সকলকে না জানাইতে পারিলে, তাঁহার মন সুস্থির হইতেছে না, তাঁহার ঔৎসুক্য তাঁহার বাক্যে ও আচরণে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিতেছিল। উৎসুক শ্রোতাদের আগ্রহান্বিত মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সত্যব্রতের সাথে মায়ের আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে।"

নীরেশ ও অমিতা একথা শুনিয়া পরম পুলকিত হইয়া উঠিল। বক্তার আনন্দবিহ্বলতাকে দ্বিগুণ করিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইল। উচ্ছ্বাস থামিলে নীরেশ বলিল, "এ শুভ-সংবাদ শুনে আমরা মহাসুখী হয়েছি। কিন্তু সকলের চেয়ে দুঃখ, এ মজলিশে আমাদের সমস্ত পরিচিত বন্ধু-বান্ধব নেই।"

কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত আনন্দজ্ঞাপন করা হইতেছিল, তাহার নিজের কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছিল না। ইন্দিরার মুখ একথা শুনিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা আসিয়া দেখা দিল। সত্যব্রতের মত দৃঢ়চেতা স্বামী, রূপবান্ ও স্নেহবান্ বন্ধু সহজে মেলে না। যে কেহ তাহাকে পতিরূপে পাইলে নিজেকে ধন্যা মনে করিবে। কিন্তু? এইখানেই ত মুস্কিল। মিলনের অভ্রংলিহ প্রাসাদ যে একান্ত-নিবিড় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, উভয়ের মধ্যে সে ঐক্যের সম্ভাবনা কোথায়! ইন্দিরার মনে হয়, শুভ্র নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল পুষ্প না হইলে যেমন দেবতার পূজা চলে না, তেমনই শুভ্র-শুচি ও সুন্দর না হইলে পতি ও পত্নীর মধ্যে প্রেমের মণি-সেতু গড়িয়া ওঠে না। হায় ভবিতব্য, তাহার পিছনে ও সম্মুখে কেবলি যে কাদার প্রলেপ লাগাইয়া রাখিয়াছে!

ইন্দিরার এই ভাব-বৈকল্য কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িতেছিল না। অমিতা আনন্দোদ্বেগ-কণ্ঠে বলিল, "ইন্দিরা-দির এতে আরও আনন্দ হচ্ছে, রেখা-দির আর শীতাংশুবাবুর বিয়েও স্থির হয়ে গেছে।"

জ্যোতিঃপ্রসাদের মন হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল। তাঁহার ভয় ছিল, শীতাংশুর সহিত কন্যার বন্ধুত্ব হয় ত কন্যার মনে

কোনও রেখাপাত করিয়াছে। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রেখা ও শীতাংশু পরিণীত হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ হয়েছে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। তা সবাই মিলে আজ আনন্দোৎসব ক'র্‌লে মন্দ হয় না। আমি কি ওদের আস্‌তে ফোন ক'রে দেব?"

অমিতা উল্লসিত হইয়া বলিল, "দিন না, সে বেশ মজা হবে।"

ইন্দিরা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে বলিল, "বাবা, আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আজ থাক্। সকাল সকাল একটু না ঘুমিয়ে নিলে, আমার শরীর সুস্থ হবে না।"

নীরেশ ইন্দিরার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া বলিল, "সে ঠিক কথা। ওঁর শরীরটা মোটেই ভাল নেই। আজ আর হল্লা ক'রে কাজ নেই। পরে আর একদিন আমরা সবাই মিলে উৎসব ক'র্‌ব।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া চলিতেছিল। সার্থকতার উপলব্ধি কিছুতেই সুস্থির হইয়া থাকিতে চাহিতেছিল না। তথাপি স্নেহময় পিতা কন্যার অসুখের কথায় আপন খেয়াল চরিতার্থ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। নীরেশকে বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

নীরেশ বলিল, "আজ না হয় আমরা যাই।"

জ্যোতিঃপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "না সে-কি হয়। এখান থেকেই খেয়ে যেতে হবে। খাবারের সব আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে। খেতে খেতে তোমাদের ভ্রমণের কথা শুনি, খাওয়া হ'লে আমার মোটরে ক'রেই আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব।"

এ কথার পরে উত্তর চলে না। নীরেশ ও অমিতা সম্মত হইল। খাইতে খাইতে অমিতা নরনারায়ণের শিকার-কাহিনী, কাল-বৈশাখীর দুর্যোগ ও তাহাদের বিপত্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। নরনারায়ণ কুমীর শিকার করিয়াছে শুনিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ পরম প্রীত হইয়া উঠিলেন, উল্লাসে বলিলেন, "এই ত চাই বাবা, বাঙ্গালীর ছেলে দুর্গমকে চিরকালই ভয় করেছে, জুজুর ভয়ে ঘরে বসে রয়েছে, তা ক'র্‌লে কি চলে? সংসারে যারা দুরন্ত, তারাই দুর্দ্ধর্ষকে পরাজয় করে। বেশ, বেশ, কালই ওকে কুমীরের বাচ্চাটা এখানে আন্‌তে বল্‌বে ত?"

নীরেশ বলিল, "আপনার কথা খুব খাঁটি। স্থিতিকে আমরা চিরকাল পূজা ক'রেছি। তাইত আমরা চ'ল্‌তে কাতর।"

টেবিলে হাত চাপড়াইয়া মিঃ গুপ্ত উত্তর দিলেন, "না, তোমরা নূতন যুগের অগ্রদূত, তোমরা বাঙালী জীবনের কলঙ্ক দূর ক'র্‌বে। অনতিক্রমনীয় যারা অতিক্রম করে, তারাই বীর। সহজকে সাধনা নয়, যা কঠিন, যা ভীষণ, যা ভয়ানক, তারই সাধনা ক'র্‌তে হবে। এই জন্যই ত আমরা রুদ্রের উপাসনা করি—ভয়ালকে আমরা ডরাই নে।"

আজ মিঃ গুপ্তের মনে কেবল যেন বক্তৃতা জাগিতেছিল।

বিদায় লইবার সময়ে অমিতা ইন্দিরাকে প্রশ্ন করিল, "দিদি, তুমি খুব খুসী হয়েছ, না?" ইন্দিরা সে প্রশ্নের জবাব দিল না। মুখে দুষ্ট-হাসি জাগাইয়া বলিল, "আরও সুখী হব বোন, যদি তোমাদেরও একটা হিল্লে হয়ে যায়।"

অমিতা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া র'হিল। নীরেশ পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে ইন্দিরার ইঙ্গিত অনুভব করিল। একথা সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, সঙ্গীত-লক্ষ্মীকে আপন ভালবাসা দিয়া সে পরিপূর্ণ ছিল।

মানুষে যে তাহার প্রেমের দাবী করিবে, এ কথা সে ভাবিয়া দেখে নাই। ইন্দিরার কথায় সেও তাই বিমনা হইয়া পড়িল, নমস্কার জানাইয়া তাহারা জ্যোতিঃপ্রসাদের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। জ্যোতিঃপ্রসাদ আনন্দের আতিশয্যে নিজেই উভয়কে পৌঁছাইয়া দিতে চলিলেন।

ইন্দিরা জ্বালা-ভরা শয্যায় গাত্র মেলিয়া দিয়া ভাবিতে বসিয়া গেল। তাহার কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। অনিশ্চিত শনি তাহার জীবনকে একেবারে রিক্ত ও ত্যক্ত-সর্ব্বস্ব করিয়া দিল। আপন জন্ম পরিচয় লইয়া যেমন সে মাথা তুলিতে পারিবে না, তেমনই নিজের অনিচ্ছাকৃত অথচ অপ্রতিরোধিত কামনার অগ্নিদাহে সে একেবারে পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজ ত আর প্রণয়ের অর্ঘ্য-থালা সাজাইয়া সে প্রেমিক স্বামীর চরণে আত্ম-নিবেদন করিতে পারে না। অথচ স্নেহ-পরায়ণ বিশ্বাসী পিতাকে সে কি বলিয়া বুঝাইবে। যে গোপন কথা আপনাকে আপনি বলা চলে না, সে কথাই বা সে অপরকে কেমন করিয়া বলিবে। ভাবনা বাড়িয়া চলে, অথচ কূল-কিনারা মিলে না। কূলহীন, সীমাহীন বেদনার উচ্ছল সমুদ্র দুর্জ্জয় অন্তরায় হইয়া পথে বিসর্পিত। ইন্দিরার চোখ দিয়া অজানিত অশ্রুধারা ফাটিয়া বাহির হইল।

২৬

নীরদা বসিয়া বসিয়া খোকাকে লইয়া খেলা করিতেছিল। খোকা বলিতে পারে না। অস্ফুট কাকলী করিয়া, অর্দ্ধস্ফুট ভাষা বলিয়া, মায়ের মনে স্বর্গীয় তৃপ্তি আনিয়া দেয়। খোকা বড় দুষ্ট, ছাড়িয়া দিলে ঘরের

জিনিষ তছ্‌নছ করে। ঘরের কোণে পিতার একটী হারানো তুলি কুড়াইয়া পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া সে মাটীতে পোঁচ দিতেছিল। তুলিটীকে রক্ষা করিবার জন্য নীরদা খোকার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। আর যায় কোথায়—খোকার কান্না। পাড়াকে মাতাইয়া তুলে। নীরদা খোকাকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা দেয়। মুখে চুমো দিয়া ভুলাইতে যায়। ভবী ভুলিবার নয়, কান্না কিছুতেই থামে না। নীরদা অনন্যোপায় হইয়া পুত্রকে তুলি দিল, তখন খোকার হাসি দেখে কে! নীরদা মুগ্ধ হইয়া খোকার সেই অনিন্দ্য অপূর্ব্ব হাসি দেখিতে লাগিল।

শিশুর হাসি ধরণীর অক্ষয় সম্পৎ। পৃথিবীর অন্ধকারের মাঝে একমাত্র জ্যোতির কমল। খোকার সঙ্গে মাও হাসিতে থাকে। পতির সহিত নীরদার সম্বন্ধ মধুর নয়। সৌন্দর্য্যরসিক স্বামী নীরদার মধ্যে আপন মানসীকে খুঁজিয়া পায় নাই, একথা নীরদা ভাল করিয়া জানিত। মাঝে মাঝে তাহার মনে ভয়ানক দুঃখ হইত। কেমন করিয়া পতির অনিচ্ছুক মনে প্রীতির বন্যা জাগাইবে, তাহার নানা উপায় উদ্ভাবন করিত। সে দিন চলিয়া গিয়াছে। যাহা পাওয়া যাইবে না, তাহা লইয়া কলহ করিয়া লাভ নাই ভাবিয়া, নীরদা আপন ভাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছিল। এমন সময়ে খোকার আগমন তাহার মনের মরা মালঞ্চে ফুট ফুটাইল।

খোকা হাসিতেছিল, নীরদা খোকাকে বলিল, "দাও না তুলি আমায়, দাও বাবা।" খোকা হাত ঘুরাইয়া লয়, আর অস্ফুট ভাষায় বলিতে চাহে, "না।" নীরদা ক্রোধের ভান করিয়া বলে, "ভারী দুষ্টু!" খোকা বুঝিতে পারে না। মায়ের মুখের দিকে খানিক গম্ভীর হইয়া চায়, পরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসে।

এমন সময় যোগেশ আসিল। পরে এই অপ্রত্যাশিত আগমনে নীরদা চমকিত হইয়া উঠিল। যোগেশ আসিয়া খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিল এবং পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা ভাল আছ ত ?"

পতির এই প্রিয় সম্ভাষণ নীরদাকে অবাক করিয়া দেয়। সে মাথার ঘোম্‌টা একটু টানিয়া দিল, পরে মধুরস্বরে বলিল, "ভাল আছি, তারপর তুমি খেয়ে এসেছ ?"

যোগেশ বলিল, "না, তবে খিদে নেই, কিছু খাব না।" পত্নীত্বের অধিকার বজায় করিবার জন্য নীরদা বলিল, "না সে কি হয় ? তোমার খাবার ক'র্‌তে কতক্ষণই বা সময় লাগবে ? তুমি খোকাকে নিয়ে একটু খেলা কর, ততক্ষণ।"

যোগেশ কৌতুক-হাস্যে বলে, "আচ্ছা, বেশী কিছু ক'রো না তা ব'লে।"

নীরদার মনে পুলকের শিহরণ বহিয়া চলে। স্বামীকে এমন একান্তপ্রিয় ভাবে সে যেন বহুদিন পায় নাই। এ যেন নূতন করিয়া প্রীতির প্রস্রবণ খুলিতেছে। যে স্বামী প্রতি পদে তাহার কথার অন্যথাচরণ করিয়া ব্যথা দিয়া আরাম পায়, সে আজ কেমন করিয়া এমন স্নেহময় হইয়াছে, নীরদা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না।

খাওয়া শেষ হইলে, নীরদা লজ্জাসুন্দর ভাষায় বলিল, "খোকার পাশে শোবে।" বহুদিন পতি ও পত্নীর ভিন্ন শয্যা। আজ নবলব্ধ যে প্রণয়, নীরদা তাহাকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। যোগেশ পত্নীর চিবুক নাড়িয়া দিয়া বলিল, "বেশ, রাণীর যা ইচ্ছে !" নীরদা মনে মনে মহা

আনন্দ অনুভব করিল। কিন্তু সে কথা লুকাইয়া রহস্য-ছলে বলিল "বা, খোকাকে তোমার ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে না ?"

পরদিন ভোরবেলায় যোগেশ আপন চিত্রশালার কক্ষে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। গতরাত্রি তাহার মনের মধ্যে যে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুশোচনা ছিল, তাহা উবিয়া গিয়াছে। সুস্থচিত্তে তাই সে ইন্দিরার সহিত বোঝাপড়া শেষ করিতে চাহে। নীরদা আসিয়া দ্বারান্তরাল হইতে বলে, "এস, চা খাবে।"

"না, আজ আর চা খাব না, আমি একটু কাজে ব্যস্ত, এখানে এসে আমায় বিরক্ত করো না।"

নীরদা ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল। যোগেশ উঠিয়া নিশ্চিন্তমনে কাজ করিবার জন্য দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু চিঠিতে কি লিখিবে, সে ভাবিয়া পায় না। নিজের অঙ্কিত ছবির দিকে সে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহে। তাহার পর কলম লইয়া লিখিতে বসে।

যোগেশ একবার লেখে, মনোমত হয় না। কাটিয়া দেয় আবার লেখে। এমন করিয়া ঘণ্টাতিনেক কাটাইয়া সে চিঠি শেষ করিল। চিঠির মাঝে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া যোগেশ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। মনের ভারি বোঝাও যেন তার কমিয়া গেল। সে চিঠি লিখিয়াছিল এইরূপ :—

"সুচরিতাসু !

তোমাকে এ চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল কি না জানি না, কিন্তু তবু লিখিতেছি, কারণ চিরদিনের বদ্ধ-সংস্কার ভূতের

ভয়ের মত মরিয়াও মরে না। অলক্ষ্যে কখন্ গা-ঝাড়া দিয়া তোলে, কেহ জানে না।

যারা নব্যযুগের জয়শঙ্খ বাজাবে, সেই সব তরুণ-তরুণীরা যেন এই অজ্ঞতার জুজুর ভয়ে শঙ্কিত না হয়।

এতখানি ভূমিকার হয়ত প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তথাপি লিখিয়া ফেলিয়াছি। রক্ত-মাংসের যে ক্ষুধা সে শারীর ধর্ম্ম, সেটাকে বড় বা ছোট করিয়া দেখিলে ভুলই দেখা হইবে। প্রাচীন কালের মানুষ আত্ম-নিপীড়নের দ্বারা নিজেকে জীর্ণ করিতে চাহিত। বৈরাগ্যের বুলি আওড়াইত, কিন্তু তবু সে লালসাকে কোনদিন এড়াইতে পারে নাই। যেখানেই তপস্যার জোর আয়োজন চলিয়াছে, সেখানেই স্বর্গের অপ্সরা আসিয়া ভুল ভাঙ্গাইয়াছে। আমাদের শিরায় শিরায় এই যে উত্তেজনা, এ জীব-ধর্ম্ম। একে যেন আমরা মিথ্যা অতি বড় আসন না দিয়া ফেলি। আমাদের দেশের অতি বড় ধর্ম্মপুত্রের মাতা কুন্তী, কুমারী-কালে যে কাজ করিয়াছিলেন, সে কাজের জন্য কেহ ত তাহার নিন্দা করে নাই। তুমি নিজেকে হতভাগিনী মনে করিয়া জীবন্মৃত থাকিও না। আনন্দের যে আকর্ষণ তোমায় ডাকিয়াছিল, আনন্দের মধ্যেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন ভাবনা করা বৃথা। বাসনার যে আবেশ, তাহার দুর্জ্জয় শক্তিকে যেন আমরা শ্রদ্ধা

করি। তোমাকে ভালবাসা যে স্বর্গীয় আকর্ষণ নয়, সে যে শুধু দেহের পিপাসায় জাত, এই অতি বড় পুরাতন কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া জানাইবার দরকার দেখি না; আমি তোমায় এই হিসাবে চিরদিনই ভাল বাসিয়াছি। ভড়ং করিয়া মিথ্যা বলিয়া লাভ নাই। সেই সত্যের জোরে আজি তোমায় বলিতে চাহিতেছি, বিনিময়ের জগতে যদি তুমি আমার প্রেমের বিনিময়ে ধরা দিতে চাও, তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্য আমি সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমার যদি অমত হয়, তোমার আমার মাঝে এই ক্ষণিকের নিবিড় পরিচয় গোপন রহিবে। তুমি নিশ্চিন্তমনে তোমার যাহা খুসী করিতে পার। এজন্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। নর ও নারীর মধ্যে স্বেচ্ছামত যখন খুসি মিলন হইবে, যখন খুসী বিচ্ছেদ হইবে, সারা সভ্য জগৎ আজ জোর গলায় একথা বলিতেছে। সেই সভ্যতার স্রোতের আহ্বান কি আমাদের দেশে ব্যর্থ হইবে? নর ও নারীর মিলনের মাঝে যে সুধার সঞ্চয় রহিয়াছে, তাহা তুমি পূর্ণমাত্রায় পান করিয়াছ। তাহা তোমার কাছে এক নূতন অভিজ্ঞতা, ওর বেশী মূল্য চাহিতে পারি না। তোমার মনে হয় ত সংঘর্ষ জাগিতেছে, সেকালের মিথ্যা শাস্ত্রের মিথ্যা সতীত্বের গলিত ও ক্লিন্ন আদর্শের কথা ভাবিয়া তুমি ভীত হয়ো না। সমাজের

যে বাঁধা নিগড়, তাহার জগদ্দল চাপের কথা ভুলিয়া যাও, ভাবিয়া দেখিও—সুস্থ নর ও নারীর মনে আকাঙ্ক্ষার আকুল আহ্বান প্রতিনিয়ত নানা পথে নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে। সে আকাঙ্ক্ষা তোমার অতি বড় সতীর মনেও কাজ করিয়া চলে। যে ভাবী কাল আসিতেছে, সে অনাবৃত সত্যের কাল। কামনার জ্বালা রহিয়াছে, তাহাকে লুকাইয়া সাধু সাজিব, ভাবী কালের মানুষ একথা বলিবে না। তুমি, আমি ও অন্যান্য আমরা সকলে সেই স্বাধীন নির্ব্বিচার মুক্তির যুগের সাধক। আমাদের আজ ভয় করিলে চলিবে না।

আশা করি, তুমি ব্যক্তিত্বহীনা সাধারণ নারীর মত কাঁদিয়া আকুল হইবে না। অসাধারণ মানুষ যারা, তারাই যুগের সারথি। তোমাকে সেই সুরের উদ্গাত্রী, সেই নির্ব্বিকার স্বাধীনতার জয়যাত্রীরূপে দেখিতে চাই। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—যোগেশ”

চিঠি লিখিয়া যোগেশ বার বার করিয়া পড়িল। মনে হইল—যতখানি জোরে স্বাধীন মিলনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবে, ততখানি জোর হয় নাই। কিন্তু আর ভাল লাগিতেছিল না। চিঠিখানি একখানি সুন্দর সুদৃশ্য লেফাফায় পুরিয়া, টিকিট লাগাইয়া সে নিজেই ডাকে ফেলিতে চলিল।

২৭

পিতা ও পুত্রীতে কথা চলিতেছিল।

পূর্ব্বদিন যোগেশের পত্র পাইয়া ইন্দিরার মন ভাল ছিল না। চিঠিখানাকে সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। তারপর টুক্‌রাগুলিকে নিজে আগুন জ্বালাইয়া পোড়াইয়াছে। তবুও তাহার মনে হইতেছিল যেন বিদীর্ণ অক্ষরগুলি বিদ্যুতের আলোকে তাহার সম্মুখে জ্বলিতেছে।

ইন্দিরা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "না বাবা, আমি কিছুতেই মনস্থির ক'র্‌তে পার্‌ছি না। নারীর কি এই দাসীত্ব ছাড়া আর পথ নেই? সে কি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পাবে না?"

জ্যোতিঃপ্রসাদবাবুর যেন বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতেছিল না। বিমূঢ়তার ভাব ত্যাগ করিয়া খানিক পরে বলিলেন, "কিন্তু মা! আমি যে কথা দিয়েছি, তুমি কি আমার কথা রাখবে না?"

ইন্দিরা উত্তর দেয় না। নারীর জীবনের সংকীর্ণ পরিধির কথা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মিঃ গুপ্তও কন্যার এই অস্বাভাবিক অসম্মতির কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া চিন্তাবিহ্বল হইয়া রহিলেন।

ইন্দিরা অনেক পরে বলিল, "আচ্ছা বাবা, ওঁদের যদি মত হয়—"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "মা, তোমার এ পাগ্‌লামী কেন হচ্ছে, আমি বুঝতে পার্‌ছি না। নারীর একক জীবন, নারীর স্বাতন্ত্র্য গল্পে নাটকে চলে মা, জীবনের দুঃখ ও ব্যথার মাঝে আশ্রয় না হ'লে মেয়েমানুষের চলে না মা!"

এমন সময়ে সত্যব্রত আসিল। জ্যোতিঃপ্রসাদের মনে হইল, হয়ত ইহা প্রণয়-কলহ। কন্যা ও বরের মধ্যে ভাব-বিনিময় হইলে এ দ্বন্দ্ব শেষ হইতে পারে, তাই তিনি সত্যব্রতকে আদর করিয়া বলিলেন, "এস বাবা! তোমার বাবা কি দেশে গেছেন?"

সত্যব্রত একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

উভয়কে কথাবার্ত্তার সুযোগ দিবার জন্য জ্যোতিঃপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা গল্প কর মা, আমার একটা চিঠি লিখ্‌তে হবে।"

সত্যব্রতের মনে আজ আনন্দ-উচ্ছ্বাস। ভাবী প্রিয়ার সহিত এমন করিয়া একান্ত মুখোমুখী হইয়া যে আলাপ জমিবে, না জানি তাহার মধ্যে কি মধু সঞ্চিত হইবে! সে আপন অধিকারের বলে আজ ইন্দিরাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, "ভাল আছ ত ইন্দিরা?"

বক্তার বাক্যে ও আলাপে রসধারা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। ইন্দিরা আবেগের এই আতিশয্যে প্রীত ও মুগ্ধ না হইয়া অনিচ্ছুক কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, ভাল আছি।"

ইন্দিরার এই শুষ্ক উত্তর, তাহার কণ্ঠের নিরানন্দ গাম্ভীর্য্য, সত্যব্রতের বিশ্বস্ত মনে গভীর ধাক্কা দিল। সত্যব্রত মনে মনে স্বপ্ন পোষণ করে, ইন্দিরা তাহাকে ভালবাসে। তাহার অন্তরের স্বচ্ছ সুনির্ম্মল প্রেম-প্রস্রবণ তাহারই পানে ছুটিয়াছে। রজনীগন্ধার মত স্নিগ্ধ-সুরভি ইন্দিরা তাহার একান্তই আপন, এই আশ্বাসে সত্যব্রতের চিত্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছিল। এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে তাহার চিত্তে যেন নূতন জাগরণ হইতেছিল। এই স্নিগ্ধ-শ্যামা ধরণী তাহার সমস্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন

অনির্ব্বচনীয় আনন্দ মাখাইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইন্দিরার এই কণ্ঠস্বর তাহাকে চকিত করিয়া তুলিল।

ইন্দিরা সত্যব্রতের কুণ্ঠা ও উদ্বেগের কারণ অনুভব করিয়া বলিল, "ভগবান্ আপনার ও আমার মাঝে আজ যে মিলনের সূত্র গ্রথিত ক'রে দিয়েছেন, ছ'দিন আগে আমি সত্যই এর জন্য লালায়িত ছিলাম, কিন্তু আপনি আমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন, আমি আপনার যোগ্য নই।"

সত্যব্রত যেন আনন্দ-শৈলের রমণীয় শিখর হইতে অন্ধকার খাদের নিম্নতলে পড়িয়া গেল। ভয়ার্ত্ত ব্যথিত স্বরে বলিল, "কি হয়েছে ইন্দিরা, তুমি এমন হেঁয়ালী ক'র্‌ছ কেন? তুমি কি আমার প্রেমে সন্দিহান হয়েছ?"

ইন্দিরা ম্লানদৃষ্টি মেলিয়া উত্তর দেয়, "না আপনার প্রেমকে সন্দেহ করি এত বড় ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু আমি আমার কলুষতা নিয়ে আপনার শুচিশুভ্র শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌বো না।"

সত্যব্রত দাঁড়াইয়া ইন্দিরার শিরীষ-পেলব করপল্লব দুটী ধরিয়া ব্যথা-মন্থর ভাষায় বলিল, "ইন্দিরা, তুমি আমায় এমন ক'রে দগ্ধিও না। তুমি আমার জীবন-পথের অচঞ্চল ধ্রুবতারা হয়ে দাঁড়াবে, আমার শূন্য গৃহস্থালী তোমার গমনের ছন্দে ঝঙ্কৃত ক'রে তোল। আমি যে বড় আশা ক'রে আছি, তুমি হবে আমার কর্ম্মের প্রেরণা, মর্ম্মের মাধুরী, তুমি হবে আমার ধ্যানের ও প্রাণের লক্ষ্মী। সে আশা তুমি ধূলিসাৎ করো না।"

বক্তার স্বর আবেগের কম্পনে কম্পিত হইতেছিল। ইন্দিরা এই পৌরুষসম্পন্ন যুবকের প্রেম-নিবেদন পাইয়া নিজেকে মহা ভাগ্যবতী

মনে করিল। কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত গ্লানি আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অজানিতে তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। তাহার রক্তিম গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নীরবে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সত্যব্রত হতভম্ব হইয়া গেল। কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "ইন্দিরা, তুমি কি আর কাউকে ভালবাস, সত্য ক'রে বল, কোন দ্বিধা করো না, আমি তোমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াব না।"

ইন্দিরা এবার কাঁদিয়া ফেলিল। পরে কান্না থামাইয়া বলিল, "অপরকে ভালবাস্‌লে হয় ত আমার নিস্তার ছিল, আপনার সহিত পরিচয়ের পর আমার সমস্ত মন-প্রাণ আপনার অভিমুখেই ছুটেছে, আপনার প্রেম জয় ক'র্‌বার পিপাসা আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু—"

সত্যব্রত কিছুই যেন বুঝিতে পারে না। তাহার মনে হয়, সারা পৃথিবী তাহার চারি পাশে যেন কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে স্থির করিয়াছিল, জীবনের ধূলিধূসর পথে ইন্দিরাকে সঙ্গী পাইয়া সে কৃতার্থ হইয়া যাইবে, অনায়াসেই সে কল্যাণকে অর্জ্জন করিয়া লইবে। কিন্তু আকস্মিক এই অনিশ্চিত প্রত্যাখ্যান বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত তাহাকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিল।

সত্যব্রত চাহিয়া দেখিল, কে যেন ইন্দিরার যৌবন-লাবণ্য-ললাম গণ্ড হইতে সমস্ত রক্ত এক নিমেষে তুলিয়া লইয়াছে। সে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, "তুমি কি জন্য এমন দুঃখ পাচ্ছ, আমি জানি না, কিন্তু নিজের কোন দোষ বা অপরাধ ভেবে যদি লজ্জিত হও, তাহ'লে তোমার ভয় নেই। মানুষ-জীবনে কে না ভুল করে? তুমি যদি

আমায় ভালবাস, তোমার সমস্ত দোষ-গুণে তুমি আমার হৃদয়-রাণী হবে।”

ইন্দিরা ব্যগ্র অধীরতায় প্রশ্ন করিল—“পার্‌বেন কি? ধরুন যদি পরে প্রমাণ পান আমি ভ্রষ্টা, কুলটা, বলুন পারবেন ত?”

সত্যব্রত থ’ হইয়া যায়। বিস্ময়ে ইন্দিরার মুখে পূর্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহে। পরে সংযতভাবে বলে, “আমি জানি, তুমি নিষ্পাপ, গোধূলির অস্তরাগের মত তুমি শুচি-সুন্দর। প্রভাতের বিকচ-কমলের মত তুমি নির্ম্মল। কিন্তু যদি কখনও হয় যে, তুমি কোনও ভুল ক’রেছ, তাহ’লে জান্‌ব সে ভুল তোমায় পঙ্কিল ক’রে তোলে নি। তুমি যে শুভ্র, সেই শুভ্রই আছ।”

এই প্রাণভরা বিশ্বাসের কি প্রত্যুত্তর দিবে? ইন্দিরা দুঃখে ভাবে, হায়, আজ বিধাতা পূর্ণপাত্র যে অমৃত-ধারা তাহার দ্বারে আনিলেন, হতভাগিনী, তাহার তাহাতে কোনও অধিকার নেই। ইন্দিরার একবার মনে হইল, সে তাহার সমস্ত দুর্ব্বলতা, তাহার জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী সত্যব্রতকে বলিয়া দেয়। কিন্তু কি যেন অজ্ঞেয় শক্তি, কি এক লজ্জা ও ভয় তাহার কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরে।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহে না, নিরবধি কাল বহিয়া চলে। ফাল্গুনের স্নিগ্ধ বাতাস বাতায়নে নিখিল জগতের আনন্দবার্ত্তা বহিয়া আনে। ইন্দিরা বসিয়া ভাবে, তাহার নিস্তার নাই। ভাগ্যদেবতা তাহাকে যে পথে দাঁড় করাইয়াছে, সেখানে সত্যব্রতের অঙ্কশায়িনী না হওয়া ছাড়া উপায় নাই। সে কিছুতেই নিজমুখে তাহার গোপন-কথা বলিতে পারিবে না। তাই আত্মস্থ হইয়া সে বলিল, “আপনি

আমায় ছেড়ে দিলে ভাল ক'র্‌তেন। আমার ভয় হয়, আমরা যে প্রেমের নীড় রচনা ক'রব, বিধাতার বজ্র অভিশাপে তা অভিশপ্ত হয়ে রইবে; কিন্তু তবু যদি আপনি আমায় চান, আমার এই নারীদেহে আপনার অধিকার রইবে না, যতদিন আমি নিজেকে না দিতে পারব, ততদিন আপনি আমাকে স্বামিত্বের জোরে আমাকে দাবী ক'র্‌তে পারবেন না। কেমন পার্‌বেন ত ?"

সত্যব্রত অবাক্ হইয়া যায়। চপল-হাস্যে ব্যাপারটা লঘু করিতে চায়, কিন্তু ইন্দিরার গম্ভীর কণ্ঠস্বরের সহিত চপলতার যেন কোনও সুসঙ্গতি নাই, তাই বলে, "তুমি কি বল্‌তে চাও, আমি ঠিক বুঝ্‌ছি না, কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় যদি ভালবেসে আমার না হও, জোর ক'রে আমি তোমায় আমার শয্যাসঙ্গিনী করব না। আমি তোমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেব।"

এইবার কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইয়া ইন্দিরা বলিল, "বেশ, এ যেন আমাদের Companionate Marriage (সখ্যের মিলন)। আপনি আমার সঙ্গী হবেন, আমি আপনার সঙ্গী হব—তার বেশী দাবী-দাওয়া আমরা কেউ ক'র্‌তে চাই না, কি বলেন ?"

সত্যব্রত কি বলিবে, ভাবিতে থাকে। শেষে উত্তর দেয়—"আমি কি ব'ল্‌ব ভেবে পাই নে ইন্দিরা, তুমি ব'ল্‌ছ আমায় ভালবাস, অথচ এত সর্ত্ত বাঁধ্‌তে চাইছ কেন, তুমি কি আমায় পরীক্ষা ক'র্‌ছ ?"

ইন্দিরা কাতর-দৃষ্টি মেলিয়া বলে, "না, পরীক্ষা নয়, আজ আপনি আমায় বুঝ্‌বেন্ না। কিন্তু যদি কোনও দিন ভগবান্ আপনাকে আমার দগ্ধ অদৃষ্টের কথা জান্‌তে দেন, তখন জান্‌বেন আমি অন্যায় করিনি।"

সত্যব্রত তাহার কাতরতায় বিগলিত-চিত্ত হইয়া বলিল—"বেশ ইন্দিরা, তোমার যদি মত হয়, আমি রাজি আছি। পশ্চিমের মানুষ যা পেরেছে, আমরা তা পার্‌ব না কেন? বিবাহ-মন্ত্রে বেঁধেও তোমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলুম। তুমি আমার দরদী বন্ধু। যদি কোন দিন ভালবেসে আমাকে আত্মীয় ক'রে নিতে পার, যদি কোনও দিন প্রেমের আকর্ষণে একাত্ম হ'তে চাও, সেই দিনই তুমি আমার পত্নী হবে, তার আগে নয়। তার আগে তুমি সঙ্গী, বন্ধু ও সহচর।"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া সত্যব্রত যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইন্দিরা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল, "আপনার এ মহত্ত্ব স্বর্গীয়। ভগবান্ করুন, আমি যেন এ মহত্ত্বের প্রতিদান দিতে পারি।"

সত্যব্রত ইন্দিরার সেই উৎফুল্ল হর্ষে হর্ষিত হইয়া বলিল, "আর আমায় 'আপনি' ব'লে দূর ক'রে রেখো না। আজ তুমি আমার জীবনের সাথী।"

ইন্দিরা লজ্জারক্ত মুখে উত্তর দেয়, "বেশ তাই হবে, আমার সমস্ত অপরাধকে তুমি বন্ধুর মত ক্ষমা করো।"

বাহিরে তখন ফাল্গুন-সন্ধ্যা রূপের জ্যোতি জ্বালাইতেছিল। পৃথিবীর এক বদ্ধকক্ষে বিরোধের ও বিচ্ছেদের যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, যুথী-পরিমল-লোভী দক্ষিণ-পবন তাহার কোনও খবর না জানিয়া চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতেছিল।

২৮

কন্যার বিবাহের খবর পাইয়া হরিদ্বার হইতে হিরণ্ময়ী বাড়ী ফিরিয়াছে। পাশে বসিয়া ব্যবধান রচনা সহজ ছিল, কিন্তু দূরে বসিয়া হিরণ্ময়ী অনুভব করিল যে, পতিকে অবজ্ঞা করিলে চলে, উপেক্ষা করিলে চলে, দূব করিলে চলে না। তাই বিবাহের খবরের চিঠি লজ্জার সঙ্কোচ ভাঙ্গিল। হিরণ্ময়ী সহজ হইয়া ঘরের গৃহিণী হইবার সংকল্প লইয়া ফিরিল। নানা আলোচনার শেষে হিন্দুমতেই বিবাহ হইল। স্ত্রী-আচারের সময় কন্যার টোপরের ছিন্ন সোলা কিছুতেই বরের টোপরের ছিন্ন সোলার সহিত মিলিত হইল না। মেয়ে মহলে ত্রাস দেখা দিল। দুধের বাটীতে উভয়ের প্রেমের প্রতীক সোলাখণ্ড দুইখানি মিলিত না হইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইল। হিরণ্ময়ী কন্যা-বিদায়ের সময় সেকেলে মায়ের মত উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, "বাবা! এর সমস্ত ভুলচুক্ মাপ ক'রে একে তুমি আপন ক'রে নিও।"

সত্যব্রত কোন উত্তর দেয় নাই, স্মিতহাস্যে অভয় দিয়াছিল।

বিবাহে জাঁকজমক হয় নাই। ইন্দিরা ও সত্যব্রত উভয়েই নীরবে কার্য্য সমাধা হউক, এজন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিল।

কুশণ্ডিকার সময় পট্টবস্ত্রপরিহিতা ইন্দিরা যখন মন্ত্র পড়িল, "যদিদং হৃদয়ন্তব তদিদং হৃদয়ং মম", তখন তাহার স্বর কাঁপিতে লাগিল। একাগ্র হইবার যে সাধনার প্রতিজ্ঞা সে করিল, জীবনে কখনও কি তাহা সফল হইবে?

ফুল-শয্যার দিন সন্ধ্যার সময় ইন্দিরা বসিয়া ভাবিতেছিল। এতকাল

সে শুনিয়া আসিয়াছে, নারীর জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন প্রেম। পুরুষের জীবনের লক্ষ লক্ষ প্রেরণা আছে, কিন্তু নারীর প্রেমই একমাত্র ভাবৈকরস অনুভূতি। বহুদিন পূর্ব্বে সে একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিল যে, মেয়েরা স্বভাবতঃই প্রেমকে জানে ও মানে। প্রেম তাদের শিখিতে হয় না। কারণ প্রেমের জ্যোতিঃশিখা দিয়েই তাহাদের জীবনের আলোক-বর্ত্তিকা রচিত।

সেই গ্রন্থেই নায়িকা যে কথাগুলি বলিয়াছিল, সে কথাগুলি এখনও যেন তাহার কানে বাজিতেছিল। নায়িকা বলিয়াছিল, "ভালবাসা নারীর স্বভাবজ, এটা তার প্রাণ-ধর্ম্ম, নারী তাই আপনাকে বিলিয়ে না দিয়ে পারে না।"

ইন্দিরা নিজের কাছে জিজ্ঞাসা করিল—সে কি খেলা খেলিতে চলিয়াছে। লবণাক্ত সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান মাঝে রাখিয়া এ-পারে রহিবে, অপর পারে একজন রহিবে, এমন করিয়া কেমন করিয়া জীবন চলিবে? দু'জনে দিনের পর দিন জীবনের বিস্তীর্ণ পথ-রেখা বাহিয়া চলিবে, কিন্তু কেহ কি কোনদিন অপরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে না?

বাড়ীর মেয়েরা ইন্দিরাকে সাজাইতে চাহিল, ইন্দিরা সাজ-সজ্জা করিল না। এ ত তাহার সাধের ফুল-শয্যা নহে। সে ত আর ব্রীড়াবনতমুখী নব-বধূর মত নম্রনেত্রে কম্প্রবক্ষে স্বামীর সহিত প্রথম সম্ভাষণ করিতে চলে নাই, সে ত প্রথম প্রণয়ের অবগুণ্ঠন ভাঙ্গিতে বসে নাই—তাহার লজ্জার কি আছে?

রাত্রিতে দীপমালা, আলো ও উৎসব, হাসি ও গানের শেষে সত্যব্রত যখন প্রেয়সীকে একান্তভাবে একেলা পাইল, তখন তাহার অন্তরে

প্রণয়ের মাদকতা জাগিয়া উঠিল। সে ইন্দিরাকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সুগৌর অধরে প্রণয়ের প্রথম মাঙ্গল্য চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিল। ইন্দিরা সত্যব্রতের আলিঙ্গনপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি আমায় ক্ষমা করো! আমি তোমার জীবনকে ব্যর্থ ক'রে ফেলেছি।"

সত্যব্রত বলিল, "থাক্ ইন্দিরা! আজ তোমার দুঃখের আরাধনা থাক্। আজকের এই শুভ-মুহূর্ত্তকে তুমি অমঙ্গল কথা দিয়ে অভিশপ্ত ক'রে রেখ না। আজ যে উৎসবের বাঁশী বেজেছে, একে তুমি থামিয়ে দিও না।"

ইন্দিরা নিজের মধ্যে দাবদাহের অগ্নি অনুভব করিল। তাহার মুখের সম্মুখে সুপেয় স্নিগ্ধ বারি, অথচ সে তৃষ্ণায় আকুল, ট্যান্টালাসের মত সারা জীবন তাহাকে ব্যর্থতায় হাহাকার করিয়া চলিতে হইবে। ভাগ্যের একি নিষ্ঠুর পরিহাস!

একবার মনে হইল, সে কেন বৃথা অনুশোচনা করিতেছে। কি এমন অন্যায় সে করিয়াছে? পিতা ও মাতার পাপের কলঙ্ক কেন তাহাকে স্পর্শ করিবে? আর ক্ষণিকের জন্য অজ্ঞাতসারে অস্পষ্ট অনুভূতিতে সে যে রক্তপিপাসাকে মিটাইয়াছে, তাহাতে এমন কিবা অপরাধ সে করিয়াছে? এই মিথ্যা গ্লানির দাবদাহ ভুলিয়া সে প্রণয়-ব্যাকুল স্বামীর মুগ্ধ আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিবে। ইন্দিরাকে কথা বলিতে না দেখিয়া সত্যব্রত পুনরায় বলিতে লাগিল, "ইন্দিরা! আজ আমার মনে আনন্দের কলছন্দ বেজে উঠেছে। আজ যেন কোনও সাধই অপূর্ণ নেই। আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান? এই

জন-কোলাহলভরা জগতের খেলা যেন নীরব হয়ে গেছে। শুধু বিশাল বিশ্বের মাঝে তুমি আর আমি আছি, তুমি আমার, একান্তই আমার, আমার বুকভরা মাণিক। সবদিকেই যেন পরিপূর্ণতার বীণা বাজছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না লক্ষ্মি! সব দিকে ঐ যে ঐক্যতান ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। তুমি ভাবছ, আমি প্রলাপ বকছি, তা নয় ইন্দিরা! তুমি আমার বৈকুণ্ঠের কমলদলচারিণী ইন্দিরা, এখানে আজ সত্যই স্বর্গ ফুটে উঠেছে।”

ফুল-শয্যার রাত্রে প্রত্যেক যুবকের মনে হয়ত এমনই কল্পনা-বিলাস জাগে, সেদিন কে যেন তাহাদের চোখে মায়ার অঞ্জন বুলাইয়া দেয়। ইন্দিরা কি উত্তর দিবে ?

এই প্রণয়-বিহ্বল বলিষ্ঠ স্বামীর একান্ত-বিশ্বাসী হৃদয়ের নিকট সে কেমন করিয়া বাসি ও আঘ্রাত কুসুমের পসরা সাজাইয়া দিবে, সত্যব্রত যদি এমন করিয়া ভাল না বাসিত, এমন করিয়া স্নেহ না করিত, তাহা হইলে হয়ত সম্ভব ছিল। কিন্তু এই স্নেহ-পরায়ণ নিঃসন্দিগ্ধ স্বামীর সহিত কপটাচরণ করিলেও যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হয়।

ইন্দিরার বুক কান্নায় ভরিয়া উঠিল। সে সত্যব্রতের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিখিল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সামঞ্জস্য—সর্ব্বত্র একটা মনোহর সুসঙ্গতি।

ঋতু-চক্র ছন্দে ছন্দে পা ফেলিয়া আসে, গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বয়ের লয়ে বিবর্ত্তন করে। নিয়মের মন্ত্রে সকলেই ঐক্যবদ্ধ, কেবল মানুষের জীবনেই কি অসঙ্গতি? জগতে সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলার সহিত তাহার কোথাও কোনও যোগ নাই।

বিহ্বল-অন্তরে সত্যব্রতের চাপা কান্নায় বেদনার অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

কান্না থামাইয়া ইন্দিরা বলিল, "তুমি আমায় এমন ক'রে ভালবেস না। আমি যে তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে পাচ্ছিনে।"

সত্যব্রত ইন্দিরাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মনস্তত্ত্বের আলোচনায় নামিল —"তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না লক্ষ্মি! আজ তোমার কাছে প্রতিদান চাইনে, আজ হয়ত প্রেম নামক যে অজ্ঞেয় অচেনা বস্তুটির কথা কাব্যে ও লেখায় পড়েছি, তার মূর্ত্তি জীবনে প্রকাশ হচ্ছে—আজ হয়ত সেই অচেনাকে ভালবাসা জানাচ্ছি—"

ভালবাসার তত্ত্ব ইন্দিরার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় না। সে ধীরে ধীরে বলে, "না তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, এ ছাড়া যে হ'তে পারে না।"

মেয়েদের ভালবাসার শেষ উত্তর এইখানে। ইহার বেশী তাহারা জানে না, বলিতে পারে না, তাহার হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভালবাসার শক্তিই ত তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। রূপের মাঝেই তাহার প্রকাশ চায়, অরূপ প্লেটো-বর্ণিত প্রেমের মধ্যে তাহারা তৃপ্তি পায় না। আপন অজ্ঞাতেই ইন্দিরা চিরন্তন নারী-হৃদয়ের গোপন কথাটি ফাঁস করিয়া দিল।

চারিদিকে ছড়ান ফুল হইতে সুবাস বাহির হইয়া আসে, বাতিদানের বাতি নীল কাঁচাবরণের মাঝে মধুর ও স্নিগ্ধ হইয়া দেখা দেয়। রাত্রির নিস্তব্ধতা প্রকাশ হইয়া যেন অনুভূতির মাঝে ধরা দিতে চায়।

সত্যব্রত অনিন্দ্যসুন্দর ইন্দিরার মুখের পানে চাহিয়া বলিল— "এইটুকুই আমার যথেষ্ট পাথেয়। তুমি যে আমায় ভালবাস, এই আমার

সব পাওয়া, তার বেশী আমি চাইনে। আজ এইটুকু অবলম্বন পেয়েই আমি সার্থক হয়ে যাচ্ছি। আমাদের দুজনের প্রেম দুজনকে জীবনের সমস্ত ধূলাবালির মাঝে বাঁচিয়ে রাখবে, এর বেশী আর জানতে চাইনে।"

এই বলিয়া পত্নীর অধরে আবেগভরে চুম্বন আঁকিয়া দিল।

ইন্দিরা কি বলিতে যাইতেছিল, সত্যব্রত তাহাকে থামাইয়া বলিল, "আজ আর কোনও কথা শুনব না। তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, এইটুকু আমাদের ফুল-শয্যার স্মৃতি, এইটুকু আমাদের দীর্ঘ পথের পাথেয়—বেশী কথা ক'য়ে এই পরমপ্রিয় উপলব্ধিকে ক্ষুণ্ণ ক'রে দিও না।"

নিজের কথার অর্থ সে যেন খানিক অনুভব করিতে চাহিল। পরে কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, "আজ অনেক রাত হয়ে গেছে তুমি ঘুমোও। কিন্তু যদি আমায় ভালবাস, তাহ'লে…"

ইন্দিরা স্বামীর ইঙ্গিত বুঝিল। সেও আগ্রহভরে প্রতি-চুম্বন দিয়া সত্যব্রতকে উল্লসিত করিয়া তুলিল।

সত্যব্রত খানিক পরেই অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িল। ইন্দিরার ঘুম আসে না। সে ঘুমন্ত স্বামীর দীপ্ত বলিষ্ঠ সুন্দর মুখের দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহে। বৈশাখের জ্যোৎস্না রাত্রি বাহিরে জ্যোতিঃধারা ঢালিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

২৯

বিবাহের কলকোলাহল থামিয়া গিয়াছে।

উত্তেজনার গতিছন্দ সমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ নিরবসর নিত্য-স্রোতের মাঝে স্বামী ও স্ত্রীরূপে তাহাদের চলিতে হইবে। অথচ

যে স্বপ্ন-মেদুর পরিবেশ স্বামী ও স্ত্রীর জীবনে প্রত্যহের মাঝে অপূর্ব্বতা আনিয়া দেয়, ইন্দিরা তাহার আশা করিতে পারে না।

রেখা সেদিন বেড়াইতে আসিল। শীতাংশু ও রেখার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের হিন্দোল-দোলা অনবরত দোল খাইতেছে।

তাহার চোখে-মুখে, ভাবে ও ভাষায় তাহার বিবাহিত জীবনের মাধুর্য্যের প্রকাশ অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছিল। ইন্দিরা অবাক্ হইয়া দেখিল, এ রেখা যেন সে রেখা নয়। তাহার সখী রেখা ও প্রেয়সী রেখার মাঝে যেন যুগান্তরের ব্যবধান।

কি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। সে যেন তাহার সমস্ত সত্তাকে বিলোপ করিয়া প্রিয়তমের চরণে ডালি দিয়াছে। রেখার মধ্যে জীবনের যে প্রাণ-স্পন্দন, তাহার অনুভূতি যেন ইন্দিরার মধ্যে নাই। যেন খেলার মাঠে দর্শকের মত খেলা দেখিতেছে, খেলায় মাতিয়া নিজেকে উত্তেজিত করিতেছে না।

তাহারা 'মধুচন্দ্র' যাপন করিবার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাইবে। রেখা ও শীতাংশু পরস্পরকে পাইয়া আজ এত কি প্রগাঢ় প্রেমে পড়িল ?

ইন্দিরার কথা কি কাঁটার খোঁচার মত উভয়ের মনে বেদনা দিতেছে না। রেখার লঘু চটুল হাস্য-লাস্য দেখিয়া ইন্দিরা স্থির করিল এ ভাবনা একেবারেই অমূলক, উভয়ে উভয়কে পাইয়া সার্থকতার তৃপ্তিতে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

জীবন কি কেবল লাভ-ক্ষতির খতিয়ান, ইন্দিরার প্রতি তাহার যে

ভালবাসা ছিল, সে কি শীতাংশুর জীবনে কোনই ছায়াপাত করে নাই, রেখার হাসিমুখ দেখিয়া আজ ইন্দিরার অন্তর যেন ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

রেখা কৌতুক করিয়া বলিল, "জানিস্ ভাই, তোর বন্ধু বলে কি নাম ধ'রে ডাকতে হবে। ও বলে এখন 'ওগো' 'হ্যাগো'র দিন চ'লে গেছে। সে আমার নাম ধ'রে ডাকে, আমি তার নাম ধ'রে ডাকি।"

ইন্দিরা কষ্টে হাসিতে যোগ দেয়, বলে, "বেশ ত! হালফ্যাসন ত মন্দ নয়।"

"না ভাই, তোরা শীতাংশুবাবুর যথেষ্ট মূল্য কোনদিনই দিস্‌নি। 'অহল্যার শাপমোচন' বইকে তোমরা কোনই আদর করনি। শীতাংশু তাই বইখানির ইংরাজী করছে। বিলাতের লোক জিনিষটাকে লুফে নেবে। এ ভরসা ওর যথেষ্ট আছে।"

মতের কি পরিবর্ত্তন। জন্মতিথিতে অভ্যর্থনা করিয়া যখন ইন্দিরা এই বই অভিনয়ের কথা বলিয়াছিল, রেখা ও সুলেখা ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। সেই রেখা আজ তাহার বিরুদ্ধে সুর গাহিতেছে।

স্বামীর রুচির সহিত কি এমনই করিয়া রুচি মিলাইতে হইবে? সে শুধু গম্ভীরভাবে বলিল, "তোর সুমতি হয়েছে দেখে আমি খুব খুসী হলুম বোন! এমনই সংশয়লেশহীন দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে তুই স্বামীর আঁধার ঘরের আলো হয়ে ওঠ্।"

রেখা ইন্দিরার বাক্যের বিদ্রূপ-কষাঘাত অনুভব না করিয়া স্নিগ্ধহাস্যে বলিল, "তাই হোক্, আমি যেন ওঁর ভালবাসার যোগ্য ক'রে নিজেকে গড়ে তুলতে পারি।"

ইন্দিরা কথা কহিল না, হাসিয়াই রেখার প্রশ্নের জবাব দিল।

স্বামী ও স্ত্রীর এই যে মিলিয়া সাধনা, ইন্দিরার মনের মধ্যে যাতনা জাগাইয়া তুলে। ইহাদের মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণ-প্রস্রবণ, তাহার স্পর্শের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া ওঠে, জীবনের শতদলে দলে দলে যে মধু লুকান আছে, কেবল কি ইহারাই তাহা নিঃশ্বাসে পান করিবে ?

তাহার জন্য কি পৃথিবীর আলো ও জীবন-সঙ্গীতের মাধুর্য্যের বাণী বহিয়া দেখা দিবে না ?

রেখার নির্ব্বাক ও প্রেমবিহ্বল মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া ইন্দিরা প্রশ্ন করিল, "কিন্তু তুই কি আসক্তির জয়ন্তীকে শ্রদ্ধা ক'রতে পার্‌বি ? এই তৃষ্ণার গরলকে গলাধঃকরণ কর্‌বি ?"

রেখা সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, "গ্লানির সুষমা যে প্রকাশ করে, তার পরে রাগ করা উচিত নয় ভাই ! 'অহল্যার শাপমোচনে' ওঁর লেখার যে অনন্য মাধুর্য্য ফুটেছে, কাব্যে তার যথেষ্ট উঁচু আসন হোক্।"

রেখা পুস্তকের নীতির কথা এড়াইয়া গেল। উঠিলেও তাহার পক্ষে নজীর ছিল। সে নজীর তুলিয়া বলিতে পারিত—"কাব্য গুরুমহাশয়ের পাঠ নহে, আনন্দ সৃষ্টি করাই তার কাজ।" ইন্দিরা বুঝিল, তর্ক করিয়া লাভ নাই। যে অসংশয় প্রেম রেখার মনে ফুটিয়াছে, সে প্রেম বিচার-বুদ্ধিহীন।

নানা কথার পরে রেখা জিজ্ঞাসা করিল—"তুই ত সই আমার সব কথা জেনে নিলি, কিন্তু তোর নিজের কথা ত কিছু বল্‌লি না।"

"আমার কথা আর কি ব'লব। সংসারে প্রতিদিন 'থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া-বড়ি থোড়' নিয়ে যাতায়াত করছে।" ইন্দিরার এই কুণ্ঠিত

অনিচ্ছুক উত্তর রেখাকে চমৎকৃত করিয়া দিল, যে মধু নর ও নারীর অন্তরে মধু ছড়ায়, সে মধুর স্পর্শ কি ইন্দিরা পায় নাই ?

"তুই কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছিলি ?"

রেখার নিবদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে বিব্রত হইয়া উত্তর দেয়—"না সই, তোর পাকামিটে বেড়েছে, দেখ্‌ছি। বিয়ে ক'র্‌লেই প্রেম যে আমাদের দেশে অনিবার্য্য গতিতে এসে পড়ে, এ কথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুই নিজে, তবু যে এমন খেলো প্রশ্ন কর্‌ছিস্‌ ?"

রেখা জবাব দিতে পারিল না। ইন্দিরার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সে জুজুর ভয়ে বসিয়া রহিল।

রেখা বিদায় হইলে, ইন্দিরা বসিয়া বসিয়া শীতাংশুর নাটকের কথা ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইল, শীতাংশু সত্য কথাই লিখিয়াছে। নর ও নারীর মাঝে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধের সীমারেখা যেমন অব্যাহত, যৌন সম্বন্ধের সীমারেখা তেমনই অপ্রতিহত রেখে দিলে হবে কি ? মানুষ দিনের পর দিন বলিয়াছে এক নারী এক পুরুষের সহচারিণী হইবে। কিন্তু বিধবা হইয়া অন্য পুরুষের সহিত যদি বিবাহ চলে, সে যদি অন্যায় না হয়, তবে কুমারী জীবনেই মিলন হইলেই বা কি দোষ ?

শীতাংশুর জোরালো কথাগুলি ইন্দিরাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। সে সঙ্কল্প করিল, এমন করিয়া সে একটা মিথ্যা কলঙ্কের চাপে নিজেকে বিনাশ করিবে না। সমাজের রুদ্র-কঠোর শাসনকে সে অবজ্ঞা করিবে। যে সামাজিক বুদ্ধি তাহাকে কাতর করিয়াছে, সে মিথ্যা, ভয়ানক মিথ্যা।

ইন্দিরা অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। সত্যব্রতের ফিরিবার সময়

হইয়াছিল। স্বামীর চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে কখনও প্রসাধন করে নাই, আস্‌মানী-রঙা দামী শাড়ী বাহির করিয়া পরিল।

স্বামীর বসিবার ঘরের জিনিষপত্র সাজাইয়া রাখিল। মালিকে ডাকিয়া টেবিলের ফুলদানিতে একটী তোড়া সাজাইয়া রাখিল। সত্যব্রত ফিরিয়া অবাক হইয়া গেল। নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইতেছে ভাবিয়া সে পরম পুলকিত হইয়া উঠিল, স্নেহার্দ্রস্বরে কহিল, "তুমি আমায় এত ভালবাস, ইন্দিরা।"

পতির এই স্নেহ-সম্ভাষণ তাহার কাণের ভিতর দিয়া যেন মর্ম্মে প্রবেশ করিল। সে, নিজের অন্তরে যে লজ্জা-দানব ছিল, তাহাকে চোখ রাঙাইয়া থামাইয়া দিয়া সহজসুরে কহিল, "যাও, এই বুড়ো বয়সে ওসব কি ভাল লাগে ?"

সত্যব্রত দুষ্ট-হাসি হাসিয়া কহিল, "ওরে আমার আদ্যিকালের বুড়ী রে, ফাল্গুন না যেতে যেতেই কেন ঝরাপাতার গান গাইছ ?"

"আমি কি আর কচি খুকী আছি। যাদের ছোট বয়সে বিয়ে হয়, তাদের এই সব হাসি মস্কারা ভাল লাগে।"

সত্যব্রত প্রসঙ্গান্তর আনিয়া বলিল, "কাল আমার কারখানা দেখ্‌তে যাবে ?"

ইন্দিরা সম্মতি জানাইয়া বলে, "যাবো।"

"সেখানে তোমার একটী মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। তাকে তুমি ভাল না বেসে পারবে না।"

নমিতার কথা সে পূর্ব্বে কিছু কিছু শুনিয়াছিল। ইন্দিরা বলিল, "নমিতা দিদির কথা ব'ল্‌ছ ?"

সত্যব্রতের মন হইতে যেন একখানি মেঘ সরিয়া গেল। নমিতাকে ইন্দিরা যে সংশয়ের চক্ষে দেখিবে না, ইহাতে সত্যব্রত অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আশ্চর্য্য এই মেয়েটী! পথের মাঝখানেই আমি এই হারা-মণিকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমার নীরস কারখানার জীবনে নমিতা রসের ও আনন্দের সঞ্চার করেছে।"

সত্যব্রতের মুখে এই প্রশস্তি ইন্দিরার নিকট বিশেষ ভাল লাগিতেছিল, এ কথা বলা দুরূহ। স্বামীর সমস্ত আদর, সমস্ত প্রেম পত্নী নিঃশেষ করিয়া নিতে চাহে। তাহার দাবী ছাড়াইয়া অপর কেহ যে কাণাকড়ি চাহিবে, সে তাহার সহ্য হয় না। কিন্তু ইন্দিরার কথায় তাহার ইঙ্গিতমাত্রও না পাইয়া সত্যব্রত বিশ্বস্তমনে নিজের গোপন কথাটী বলিয়া ফেলিল, "জান ইন্দিরা, একদিন নমিতাকে ভালবেসেছি ভেবে ওকে বিয়ে ক'র্‌তে চেয়েছিলুম, কিন্তু আশ্চর্য্য, নিরাশ্রয়া নমিতা আমায় উপেক্ষা ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমি ভালবাসিনি। স্নেহ ও অনুকম্পা ক'র্‌তে গিয়ে তাকে আমি আঘাতই দিয়েছি।"

একান্ত নিঃসঙ্কোচ আত্মকথা। ইন্দিরা স্বস্থ হইল। নমিতার প্রতি হয়ত স্বামীর মনে একটু আগ্রহ আছে, কিন্তু যে ভালবাসায় ঈর্ষ্যা জাগে সে ভালবাসা নাই।

৩০

ইন্দিরা কারখানার কর্ম্মচঞ্চল শ্রমিকদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া খুসী হইল। সত্যব্রত তাহাকে সমস্ত বিভাগের কার্য্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝাইয়া

দিতেছিল। ইন্দিরা অননুভূত এক আনন্দ কর্ম্মস্রোতের হিল্লোল লক্ষ্য করিতেছিল। এমন করিয়া সে জীবনের ধূলিধূসর পথযাত্রাকে কখনও অনুভব করে নাই। সংসারের জীবনযাত্রার জন্য চারিদিকে যে কত বিচিত্র আয়োজন চলিয়াছে। কত যে দুঃখ সংগ্রাম, কত যে বিরাট্ প্রতিযোগিতা চলিতেছে, ভাবিয়া তাহার ইয়ত্তা করা চলে না। কিন্তু এতদিন জীবনের এই গন্ধের সহিত তাহার একান্ত অপরিচয় ছিল।

ক্ষুধার যাতনা যে কি অপরিসীম, দারিদ্র্যের মর্ম্মদাহ যে কি অরুন্তুদ, আজ স্বামীর আশ্রমস্থ শ্রমিক পরিবারে তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া সে অবাক হইয়া গেল। সে সত্যব্রতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমায় এদের মত কাজে লাগিয়ে দাও না?"

"কেন? আমার সঙ্গ কি তোমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে?" অহেতুক এ অভিমান কেন? সে ত চুক্তি করিয়া লইয়াছে, চুক্তির বেশী দাবী করিয়া কেন মিথ্যা মান-অভিমানের পালা? সে কিন্তু এ সব প্রশ্ন এড়াইয়া বলিল, "সে কথা ত আমি বলিনি।"

বেদনায় তাহার চোখে যেন জল আসিতেছিল, কিন্তু সে কাহাকেও দোষী করিবে না, তাহার অবিবেচনার ফল এমন করিয়াই ত তাহাকে ভোগ করিতে হইবে।

সত্যব্রত পত্নীর পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া লজ্জিত-কণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা করো লক্ষ্মি! আমার সব কাজ ত তোমারই কাজ—সব ভার নিয়ে আমায় এখন খালাস দাও।"

ইন্দিরা উত্তর করিল না। এমন করিয়া সহজে ভার নিতে পারিলে

ত কোনই দুঃখ ছিল না, কিন্তু সে ভার যে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

পতির কাছে এই বশ্যতা তাহার ন্যায্য দাবী হইলেও ইন্দিরা চাহিতে পারিতেছিল না, তাই বিরোধ ও বৈষম্য জাগিয়া উঠিতেছিল।

সত্যব্রত ইন্দিরার কথায় সায় দিলেও, ইন্দিরাকে আর দূরে রাখিতে চাহিতেছিল না। মুখে সে যাহাই বলুক, মনের কোণে বহু যুগাগত সংস্কার বাঁচিয়া আছে, পুরুষের যোদ্ধা মন নারীকে শুধু সমকক্ষ ও বন্ধু করিয়া সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছিল না। সে যাহাকে হৃদয়ের মাঝে পাইয়াছে, তাহাকে একান্তভাবে সম্মান করিতে চায়। কারখানার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আসিয়াছে শুনিয়া হট্টগোল করিয়া তুলিল। চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "মা আমাদের ছুটী দাও।"

এই সমস্ত রিক্ত ও নিরাশ্রয়দের মুখে এই নব সম্বোধনে ইন্দিরা যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিল। সে সত্যব্রতের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সম্মতি বুঝিয়া বলিল, "বেশ, আজ তোমাদের ছুটী।"

পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ ওদের কিছু খেতে দিলে হয় না?"

সত্যব্রত উত্তর দিল, "বেশ, তোমার ইচ্ছামত যা-খুসী ওদের খাওয়াও। আমি ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাচ্ছি, তুমি ফরমাস করো।"

ম্যানেজার আসিলে, ইন্দিরা শ্রমিকদের সেদিন ছুটী করিয়া মিষ্ট মুখের ব্যবস্থা করিতে বলিল। কর্ত্রীর আদেশ শুনিয়া ম্যানেজার শশব্যস্ত হইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিল।

সত্যব্রত ইন্দিরাকে নমিতার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া কারখানার আফিসে চলিয়া গেল। সেখানে কয়েকটী কাজের বিলি ও ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার উপর এই দুইটী নারীর প্রথম পরিচয়ের মাঝে সে আড়াল হইয়া দাঁড়াইতে চাহে না।

ইন্দিরা নমিতার কথা শুনিয়া মনে মনে তাহার রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। সাক্ষাৎ পরিচয়ে দেখিল, কিছুই বাহুল্য বলে নাই—সত্যই ভুবনবিজয়িনী রূপ, লীলাকৌশলসম্পন্না দর্পিত দাম্ভিকার রূপ নয়, অথচ তেজস্বিনী মহিমাময়ী মূর্ত্তি। ইন্দিরা সম্ভ্রমে কহিল, "তোমার কথা অনেক শুনেছি দিদি! আজ দেখে নয়ন সার্থক হ'ল।"

নমিতা ইন্দিরার শান্ত ও স্নিগ্ধ মুখের পানে চাহিয়া বুঝিল, এ পরিহাস নয়, এ আন্তরিক উচ্ছ্বাস। তাই সংযতভাবে উত্তর দিল, "আমায় আবার দেখে কেউ সুখী হ'বে, একথা বোন আমি স্বপ্নেও মনে ক'রতে পারি না।"

ইন্দিরা হাসিয়া উত্তর দিল, "কস্তুরী-মৃগ গন্ধ বিলায়, কিন্তু সে সে-কথা জানে না।"

"এ তুমি বাড়িয়ে বল্‌ছ ভাই, সংসারের নিভৃত কোণে নীরবে পড়ে আছি, দুনিয়ার চলায় আমার কোনই প্রয়োজন নেই, এই নিষ্ফল ব্যর্থ জীবনকে বাড়িয়ে তুমি আমায় লজ্জিত করো না।"

ইন্দিরা নমিতার সহিত আলাপ করিয়া পরমানন্দ পায়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই মেয়েটী নিজের দীনতা দিয়া বাক্যকে জটিল করে না, অথচ প্রগল্‌ভতা দিয়া বাক্যালাপকে অসহ করে না। সে স্নিগ্ধহাস্যে বলিল, "তৃণভূমিতে যে কচি তৃণপল্লব প্রভাতের সবুজিমার মাঝে অতি সামান্যতম

একটু আভা দিয়েছিল, সে কি ব্যর্থ হয়েছে ; না বোন সংসারে কিছুই ব্যর্থ নয়। কিন্তু থাক্, গৌরচন্দ্রিকা ক'রে সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমি তোমার জীবনের মর্ম্মসুরটী জেনে যেতে চাই বোন্। কেমন ক'রে তুমি এমন শান্তি ও দীপ্তিলাভ করেছ, সে কথা আজ আমায় বল্‌তে হবে।"

"না ভাই, মহামুস্কিলে ফেলে দিলে আমায়, আমি ত পণ্ডিত নই, তত্ত্বকথাও জানিনে। কে আমার এমন শত্রু যে তোমার কাছে আমার নামে এমন লাগিয়েছে ?"

ইন্দিরা তুষ্ট-হাসি হাসিয়া বলিল, "যেই বলুক সে তোমার শত্রু নয়, সে তোমার পরমশুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র, আর সে তোমার মিথ্যা স্তব গেয়ে নিজেকে ছোট করেনি।"

ইন্দিরার সুন্দর ভাবতদ্গত মুখখানির প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে নমিতা কহিল, "ভাই বেশী লেখাপড়া করিনি, এ কালের কথা ও মত জানিনে, সেকালের মত মেনেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের দেশের সহজ সাধনার সুর ত আমাদের দেশের শাস্ত্রে শোভনভাবেই লিখেছেন।"

সে আরও বলিল, "আমি ত বেশী পড়ি নে, ছোট বয়সে রামায়ণ ও মহাভারত মন দিয়ে পড়েছিলাম, এখন গীতাখানি মাঝে মাঝে পড়ি। কি মহৎ গ্রন্থ, যতই পড়্‌ছি, ততই মনে হচ্ছে যেন কিছুই বুঝ্‌ছি না।"

বক্তার ভাবোচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দিরা খুসী হইয়া উঠিল। উৎসুক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "চল বোন, তোমার ঘরকন্না দেখে আসি।"

সামান্য দুইখানি ঘর, অথচ কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একখানিতে শাশুড়ী থাকে, অপরখানি নমিতার জন্য। বিলাসের কোনও আয়োজন

কোথাও নেই, অথচ সব জিনিষই তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। একটা ছোট আলমারীতে কয়েকখানি সুন্দর বাঁধান বই, টেবিলের উপর গীতাখানি সযত্নে রক্ষিত।

বিধবা হইয়া নিজেকে জীবন্মৃত না মনে করিয়া, যে নারী বিনষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এমন ভাবে জীবন-যাত্রার সংগ্রামে যোগ দিয়াছে, ইন্দিরা তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিল না। বিদায় লইবার সময়ে সে বলিল, "তুমি আমার দিদি, আজ মনে হচ্ছে তোমার সাথে আমার যেন জন্মজন্মান্তরের বাঁধন। তুমি কাল আমার কাছে যাবে, কি বল দিদি?"

নব-পরিণীতা এই তরুণী-বধূ স্বামীর সঙ্গ পাইয়াও এমন ব্যাকুলা কেন, নমিতা কিছুতেই তাহা অনুমান করিতে পারিল না। সে কৌতুক করিয়া বলিল, "তোমাদের প্রেমের ভরাজোয়ারের দিনে খড়কুটা নিয়ে কি ক'র্‌বে বোন্? আমরা গিয়ে আর খালি খালি উত্যক্ত করি কেন!"

রোষের ভান করিয়া সে নমিতাকে ক্ষুদ্র একটা কিল দেখাইল, পরে বলিল, "না দিদি, তুমি এসব নষ্টামি কর্‌তে পারবে না। কাল অবশ্য যাওয়া চাই।"

বাহিরে সত্যব্রতের আগমন জানা গেল। নমিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "বেশ তাই হবে, কিন্তু আজ্ আর মিলন-ব্যাকুল চক্রবাকদম্পতীকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা চলবে না।"

ইন্দিরা উত্তর দিল না। শুধু স্মিতহাস্যে প্রত্যভিনন্দন জানাইয়া চলিয়া গেল।

৩১

নূতন অতিথিকে সমাদর করিবার জন্য সত্যব্রত যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিল। পুষ্পবনসুন্দর সুদৃশ্য দ্বিতল একখানি নূতন বাড়ীতে নব-গৃহিণীর জন্য নূতন নূতন আসবাব কিনিয়া, সত্যব্রত আধুনিক সাজ-সজ্জায় তাহাকে পরিপাটি করিয়াছিল। আয়োজনের প্রাচুর্য্য ও নূতনত্ব ইন্দিরাকে মাঝে মাঝে গর্ব্বিত করিয়া তোলে।

যে মানুষটী আপন অনারব্ধ গৃহস্থালীর ভার দিয়া তাহাকে আহ্বান করিবার জন্য এমন ঘটা করিয়াছে, তাহার দিকের ভালবাসাকে সে কিছুতেই ছোট করিয়া দেখিতে পারে না।

সকালে উঠিয়া পাচক আসিয়া জানাইল, "মা, আজ কি রান্না হবে?"

সত্যব্রত সকালে কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়াছে, ইন্দিরা একখানি বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছিল। পুস্তকের পাতায় সে চোখ বুলাইতেছিল, তাহার মন তাহাতে বসিতেছিল না।

পাচকের আলাপ তাহার মনে নূতন কর্ম্মের ইঙ্গিত জাগাইয়া দিল। সে বলিল, "যাও ঠাকুর, তুমি নীচে যাও, আমি আস্‌ছি, আজ আমিই রান্না ক'র্‌ব।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর এ উত্তর তাহার মনোমত হইল না। রান্নাঘরের মাঝে সে যে জঞ্জাল এতদিন পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিয়াছে, গৃহিণী কিছুতেই তাহা ক্ষমা করিবেন না। তাই এই ভয় এড়াইবার জন্য সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "মা, আপনার কষ্ট হবে, বাবু হয় ত রাগ ক'র্‌বেন।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইন্দিরা কড়া জবাব দিল—"যাও আমি নিজেই রাঁধবো।" এই ধনুর্ভঙ্গ পণ নিবারণ করিতে না পারিয়া, পাচক অশান্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু নিরুপায় মৌনতায় নীচে নামিয়া গেল।

আজ স্বামীর জন্য সে স্বহস্তেই রান্না করিবে। বাজারে চাকর পাঠাইয়া নানাপ্রকার সওদা করিয়া, সুস্বাদু বিবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল। সত্যব্রতের তবুও দেখা নাই। স্নান শেষ করিয়া ইন্দিরা নূতন একখানি মাদ্রাজী শাড়ী পড়িল। বেশবিন্যাস করিয়া বাহির হইতেই দেখিল, সত্যব্রত আসিতেছে।

"বাঃ! এত দেরী ক'রে আস্‌ছ যে? তোমার জন্যে রান্নাবান্না ক'রে কখন থেকে আমি বসে আছি।"

কথার সবটুকু সত্যব্রত বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "ইস্, এর মধ্যেই যে কড়া শাসন আরম্ভ হয়ে গেল, এবার থেকে বুঝি গৃহিণীর রাজ্যপাট অধিকার করবে।"

"যাও, আমি কারও কাছে জবাবদিহি করতে পারবো না।"

সত্যব্রত হাসিয়া বলিল, "বেশ ত, তোমার যুক্তি অতি উত্তম, তুমি নিজে জবাবদিহি করবে না, অথচ অপরের কৈফিয়ৎ তলব করবে, এ ত বেশ মজা।"

ইন্দিরা লজ্জিত হইয়া বলিল, "কিন্তু কখন্ তোমার জন্য ভাল ভাল খাবার তৈরী করেছি, সব জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

এইবার সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সত্যব্রত কৌতুকের সহিত বলিল, "তাই নাকি! বেশ আমার অপরাধ হয়েছে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।"

আহারে বসিয়া গল্প জমিতেছিল। সত্যব্রত বলিল, "ভাল কথা, শুনেছ, নীরেশের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। অমিতার বাপ প্রস্তাব করেছেন।"

"তাই নাকি?"

"হাঁ, আজ নীরেশের ওখানেই গিয়েছিলুম। বেচারী বড় ঘাব্ড়ে গেছে। ও বলে, স্বরের আবেদন শুনেই পার্ছে না, শেষকালে প্রিয়ার আবেদনের চাপে হয়ত মারা যাবে।" উভয়ে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ সহজ হইয়া উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে মনে হয়, পতি ও পত্নীর দাবী হয়ত উভয়কে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে, কিন্তু এমন করিয়া সহজভাবে যদি চলে, তবে ভাবনার বিষয় নাই।

হঠাৎ ইন্দিরা বলিল, "বাঃ! কিছুই ত খেলে না, এমন ক'র্লে ভয়ানক রাগ হবে আমার। সব নিজে হাতে রেঁধেছি আমি।"

সত্যব্রত হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "ঠাকুরের হাতে খেয়ে খেয়ে অন্নব্যঞ্জনের অমৃতস্বাদ আর মুখে লাগে না, সে অক্ষুধাকে আজ প্রেমের জোরে কেমন ক'রে তাড়াই?"

"হয়েছে সাধুপুরুষ, বক্তৃতা থাক্, আম-সন্দেশ আর ছুটো খেয়ে নাও।" পরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাও ঠাকুর! বাবুকে সন্দেশ দিয়ে যাও।"

"তা নিচ্ছি, কিন্তু তোমায়ও ছুটো নিতে হবে ব'লছি। ঐ পাতে দই দাও বলার মানে জান ত?"

ইন্দিরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, "তোমার সঙ্গে পারবার যো নাই।"

আহারের পরে সত্যব্রত শয়ন করিল। আজ কোথাও বাহির হইবে না। সে একখানি মাসিকের পাতা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহাতে দৃষ্টি বুলাইতেছিল। ইন্দিরা পাশে বসিয়া ব্যজনী চালনা করিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ চলিল।

নীরেশবাবুর বিবাহ বিষয়ে ইন্দিরার আগ্রহে সত্যব্রত কহিল—"একান্তই যদি শুনবে ত বলি। নীরেশ মুখে বলছে, সে বিয়ে ক'রবে না। সুরসাধনা ক'রে জীবনটা কাটাবে—সুর-লক্ষ্মী না কি তার একান্ত ও অদ্বিতীয়া প্রিয়তমা।"

"হাস্‌ছ কেন?"

"কথাটা আসলে ফাঁকি ব'লে, মুখে যতই ব'লছে না, মনে মনে ততই গান বাঁধছে, 'তোমারেই শুধু ভালবেসেছি'।"

ইন্দিরা হাসিতে হাসিতে বলে, "এ নিয়ে আর এত পরিহাস কেন? তোমাদের সব শিয়ালের এক রা, বিয়ের আগে প্রতিজ্ঞায় সকলেই ভীষ্মদেব, আর বিয়ে হয়ে গেলেই মস্‌গুল।"

সত্যব্রত হাসিয়া বলে, "তাই নাকি, কিন্তু আমি ত এখনও হতে পারি নি। এখনও ত ব'ল্‌তে পারি নি, 'ত্বমসি মম ভূষণম্, ত্বমসি মম জীবনম্, দেহি পদপল্লবমুদারম্'।"

এই বলিয়া সত্যব্রত সাগ্রহে বাহু বাড়াইল।

"যাও, তুমি ভারী দুষ্টু, এখন ঘুমাও—আমি পালাই" বলিয়াই আলিঙ্গন এড়াইয়া ইন্দিরা ঘর ছাড়িয়া চলিল।

৩২

অপরাহ্নে অন্তরাগ আসিয়া দ্বিতলের বারান্দায় বিদায় মাগিতেছিল। সুন্দর সুপুষ্ট একটি বিড়াল লইয়া ইন্দিরা খেলা করিতেছিল।

ভৃত্য আসিয়া জানাইল—নমিতা আসিয়াছে। ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া সে নমিতাকে অভিনন্দন করিয়া উপরে লইয়া চলিল।

উপরের তলায় চারিখানি ঘর, বসিবার ঘরে উভয়ে দু'খানি সোফায় বসিল। চারিদিকে সুবিন্যস্ত ছবি। ইতালীর, হলাণ্ডের ও ইংলণ্ডের সেরা সেরা চিত্রকরদের ছবি ছিল। সেই সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকরদেরও নানা আলেখ্য দেওয়ালে টাঙানো ছিল, নমিতা তন্ন তন্ন করিয়া ছবি দেখিতে লাগিল। দেখা শেষ হইলে বলিল—"বাঃ! তোমাদের পছন্দ আছে। মনে হয় যেন চিত্রশালার সেরা ছবিগুলি ঘরে দেখছি।"

"হাঁ, ওঁর ছবির সখ আছে। বিজ্ঞানের ভূত ওঁর মনের সমস্ত রসকে নিঃশেষ করে নাই।"

দেওয়ালের এক পাশে যোগেশের দেওয়া মৎস্যকন্যার ছবিটি ছিল। নমিতা এই ছবিটিকে দেখাইয়া বলিল, "খাসা ছবি হয়েছে—ওদের নায়িকা আর তোমার চেহারায় হুবহু মিল আছে।"

"হাঁ, ওটা আমার বন্ধু যোগেশবাবুর দান—আমার জন্মতিথির উপহার—আমাকে মডেল ক'রেই ছবি এঁকেছিলেন।"

বন্ধু বলিয়া ফেলিয়াই মনে চমক লাগে। যোগেশই শনিগ্রহের মত তাহার সমস্ত জীবনটাকে বিরূপ করিয়া দিয়াছে। ঐ ছবিটাকে বহুবার সে নষ্ট করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহা পারে নাই।

সত্যব্রতের সহিত ইন্দিরার বিবাহের প্রসঙ্গ হইতেই যোগেশ অজন্তার চিত্রকলা দেখিতে গিয়াছিল, তাহার উপস্থিতি ইন্দিরার নিকট বিষম অনর্থের কারণ হইত। কিন্তু সে বুদ্ধি করিয়া ইন্দিরার জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে। বাহিরে সরিয়া গেলেও ভিতরে যায় না। যোগেশ ধূমকেতুর মত তাহার জীবন ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

নমিতা ছবি দেখার পর সহসা বলিল, "চল বোন্, তোমাদের ঘরকন্না দেখে যাই।"

নমিতা এ বাড়ীতে আর আসে নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কৌতূহলের সহিত সমস্ত জিনিষই দেখিল। প্রতি কক্ষই সুষমার অপূর্ব্ব সুসঙ্গতিতে চিত্ত বিমোহন করে। প্রত্যেক আয়োজনই সে আনন্দ ও মনোযোগের সঙ্গে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিল। বড়লোকের জীবনযাত্রার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না, তাই তাহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক শয়ন-কক্ষ দেখিয়া, সে সকলের চেয়ে অবাক হইয়া গেল। কৌতূহল কমাইতে না পারিয়া বলিল—"একি ব্যাপার বোন্?" নমিতার উৎসুক হতভম্ব মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া ইন্দিরা হাসিতে হাসিতে বলিল, "যুগ যে চলেছে, সে খবর কি জান বোন্! আমরা ঠিক স্বামী ও স্ত্রী নই, আমরা শুধু পরস্পরের বন্ধু।"

নমিতা বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইন্দিরার কথা যেন সে বুঝিতে পারে নাই। উপন্যাসে এরূপ কথা সে কিছু শুনিয়াছে, কিন্তু সত্যকার জীবনে এ প্রলাপোক্তি কেহ করিবে, নমিতা স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করে নাই। এই অপূর্ব্ব উক্তি শুনিয়া হতবুদ্ধি নমিতা কুণ্ঠিত

অধোমুখে নিরুত্তর বসিয়া রহিল। পরে অসংলগ্ন চিন্তাগুলিকে সংহত করিয়া প্রশ্ন করিল—"আমার সঙ্গে কি কৌতুক করছ বোন্?"

"না মোটেই নয়, কিন্তু তুমি এমন অবাক হয়ে গেলে কেন ভাই?" ইন্দিরার বাক্যে কোথাও চাপল্য বা লঘুতা ছিল না। নমিতা অবিশ্বাসকে যতক্ষণ পোষণ করিয়াছিল, ততক্ষণ যেন সুস্থ ছিল—কিন্তু ইন্দিরার শান্ত প্রসন্ন উত্তর তাহাকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু এও কি সম্ভব, গতদিনের স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। প্রথম মিলনের সেই অজস্র আবেগের কথা আজও যেন মনে লেগে রয়েছে। দিন ও রাতের নিত্যকর্ম্মের মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদটুকু জমত, তা তাঁর অসহ্য হয়ে উঠ্‌ত।"

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল, "প্রেমের সেই নিত্য নূতন লীলা কি আমাদের মধ্যে নেই ভাব্‌ছ?"

"কিছুই ভাব্‌ছি নে, শুধু অবাক হয়ে আছি, বুঝতে পার্‌ছি নে। সত্যিই তুমি আমায় ফাঁকি দিচ্ছ কি না?"

"ফাঁকি নয়, এ কথা তুমি ভাবতেই পার না যে, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের শুধু সখা হয়ে চল্‌তে পারে?"

"ভাবতে পারি কৈ? এমন ক'রে আমরা ত ভাব্‌তে শিখি নি। আমাদের চিরকালের শিক্ষা এর বিপরীত। মেয়েমানুষের স্বাতন্ত্র্যকে আমরা কল্পনা ক'রতে পারি নে। শিব-শক্তির মিলনের কামনাই ত আমরা অনুক্ষণ কর্‌ছি।"

অজানা আশঙ্কায় ইন্দিরার মন দুলিতে লাগিল। নিজের জীবনের সমস্ত কথা নিয়ে আলোচনা তাহার নিজের প্রিয় লাগিবে না। কিন্তু

কথা উঠিয়াছে, তাহাকে থামাইয়া দেওয়া চলে না। সে তাই বলিল, "স্বামীর চরণ ধরেই চিরকাল দাসীপনা ক'রতে হবে, একথা কি আমরা কোনও দিন ভুলতে পারব না? নবযুগের যুগশঙ্খ কি আমাদের কাণে বাজবে না? আশ্রিতা লতা হওয়াই কি চরম সুখ? যে নারী একান্তভাবে স্বামিসেবার জন্য আত্মবিনষ্টি না ক'রে, জীবনকে দেখতে চাইবে, সে কি কেবলই হেয়?"

নমিতা স্নেহকরুণ দৃষ্টি ইন্দিরার সমস্ত চোখে-মুখে বুলাইয়া নিল। পরে মধুর স্বরে কহিতে লাগিল, "না বোন্, তর্ক ক'রতে চাইনে। কারণ তোমাদের সাথে তর্কে হয় ত পারব না। কিন্তু যে চলাটাকে তোমরা সার্থক ব'লছ, সে চলা যাতে শ্রেয়ের পক্ষে হয়, সে কথা কি তোমরা দেখবে না?"

"কেন?"

"মানুষের সভ্যতা ত বেড়ে চলেছে। সে প্রগতির জন্য চাই, যুগোত্তর মানুষ—তাদের আগমনের জন্য, তাদের আবির্ভাবের জন্যই ত নব-নারীর মিলন, লালসামত্ত উদ্দামতার জন্য ত পরিণয় নয়। এই যে বিশ্বসৃষ্টি—একে পূর্ণতার পানে, একে প্রগতির পানে যারা নেবে, সেই সব নরদেবতার হয় ত কাহারও জননী তুমি হ'তে পার। সেই মাতৃত্বের সাধনা তোমায় ক'রতে হবে।"

নমিতার উচ্ছ্বসিত ভাব-তরঙ্গ ইন্দিরাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে ক্ষণিক থামিয়া বলিল, "ঐখানেই ত মূলতঃ প্রভেদ হচ্ছে। তুমি ভাবছ প্রেম নারীদের একান্ত প্রিয়তম বস্তু। মা হওয়াই তার চরম কথা। কিন্তু নবযুগে বলছে তা নয়। নারীর ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে

হবে। পুরুষ যেমন জগতের কৃষ্টিকে শিল্পে, সঙ্গীতে ও কলায় মহীয়ান্ ক'রে তুলেছে, নারীও তেমন পারে, নারী যদি পুরুষের লালসার ইন্ধন না যুগিয়ে আত্মচেতন হয়ে ওঠে, তবে পৃথিবীর মহদুপকারই হবে।"

এই অপ্রত্যাশিত বাক্য নমিতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে ভাবিয়াছিল, এই অপ্রিয় আলোচনা থামাইয়া দিবে। কিন্তু সে কল্পনানেত্রে এই নবপরিণীত স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যে বিরাট ব্যবধান দেখিতে পাইতেছিল, তাহার জন্য বেদনা অনুভব করিতেছিল। মিথ্যা আদর্শজাত তিক্ততা উভয়ের ঋজুগতি প্রেমোদ্ভবের পথে বাধা না হইয়া দাঁড়ায়, সেই আশায় নমিতা সহজ সুরে বলিল, "না বোন্, এ বুলি তোমার নিজের মনের নয়, তুমি আত্মবঞ্চনা ক'রে অনর্থক লাঞ্ছনা ভোগ ক'রছ। যে মাটীতে আমরা জন্মেছি, তার যুগ-সঞ্চিত সাধনা আমাদের শিরায় শিরায় বইছে, তাকে তুমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার না। কেমন ক'রে ভুল্‌বে বোন্, যুগে যুগে সতী-নারী যে পবিত্র হোমশিখা জ্বেলেছেন, তার পুণ্য-আভা এখনও নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি। সে আভা তোমার মনের মাঝে এখনও জ্বল্‌ছে।" কি সুগভীর আত্মপ্রত্যয়! বক্তার দীপ্তোজ্জ্বল কণ্ঠ, অনবনমিত আত্মবিশ্বাস, ইন্দিরাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল। ইন্দিরার বোধ হইতেছিল, যেন নমিতার কথাই তার কথা।

নমিতা বলিতে লাগিল, "ভাগবতে কর্দ্দম ও দেবহুতির গল্প পড়েছি, বোন্। সে এক অপূর্ব্ব বাণী। মাতা হওয়া ত যে-সে ব্যাপার নয়। কতখানি সংযম, কতখানি একনিষ্ঠতা হ'লে তবেই মানুষ সুপুত্রের জনক-জননী হ'তে পারে। তুল্যাধিকারের বাণী ভারতবর্ষের কথা নয়,

বোন্। এই বিরোধের মন্ত্র পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়ায় আমাদের পূজাবেদীকে কলুষিত ক'রে তুলেছে, এর মিথ্যা স্তোকে তুমি প্রলুব্ধ হয়ো না। সমান হওয়াটা বড় কথা নয়, এক হওয়াই বড়। স্বামী ও স্ত্রী এক মন, এক প্রাণ হ'য়ে আনন্দ-নিকেতন গ'ড়বে, সেখানে রেষারেষির আস্ফালন নেই, প্রতিযোগিতা নেই, একে অপরকে সম্পূর্ণ ক'রে বৃহত্তর প্রগতির দিকে চ'লবে।"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা ব'লে নমিতা যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। নমিতার কথা তাহার মনের গোপনতম স্থানে বেদনা জাগাইতেছিল; কিন্তু সে মুখে যতই তর্ক করুক, এ বুঝি তাহার অন্তরে সাড়া পায় না। এই দ্বন্দ্বের জন্যই সে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

নমিতার কথাগুলি তাহার মর্ম্মস্থানে বিঁধিলেও সে যেন কেবল তর্কের খাতিরেই বলিল, "সংসারে স্বামীকে পাওয়াই ত চরম সার্থকতা নয় বোন্, বিপুল জগতের বিরাট লীলায় নারীকেও বিশেষ অবদান দিতে হবে।"

"তুমি ভাই সমস্ত ব্যাপারটা অনর্থক জটিল ক'রে তুলছ, যে নারী পত্নীত্বের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করে নি, সে যে সাধনায় ইচ্ছে, প্রবৃত্ত হোক্, কিন্তু যে মিলনকে বরণ করেছে, সে কেমন ক'রে ঐক্যকে দূর ক'রে থাক্‌বে? ভোগের পথে ত সুখ নেই, ত্যাগ ক'রেই ত শান্তি। নিজেকে বাড়িয়ে, নিজেকে জোর গলায় যত প্রচার ক'রবে, ততই জীবনে জঞ্জাল জম্‌বে। ওসব ভুলে সমর্পণ কর, শরণাগতি লও, তখন দেখবে, এ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। ধরা দিলেই বাঁধন খুলে, আর বাঁধনের ভয়ে যতই পিছু হট্‌বে, বাঁধনের গিঁট্ ততই শক্ত হবে।"

ইন্দিরা কথা কহিল না। নীরবে নমিতার কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। শুদ্ধচিত্তে সে নমিতার আত্মসমর্পণের বাণীর কথা ভাবিতেছিল। এমন অসঙ্কোচ আবেগে যদি সে পতির নিকট আপনাকে মেলিয়া ধরিত, তাহা হইলে ত তাহার জীবনে কোনই অপূর্ণতা থাকিত না। মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া সে কি শুধু ক্লান্ত হইয়া উঠিবে।

অন্যমনস্ক ইন্দিরাকে সম্বোধন করিয়া নমিতা বলিল, "এখন উঠি বোন্, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দেরী হয়ে গেলে শাশুড়ী আবার কি মনে ক'র্‌বেন। অনেক বক্‌লুম, আমায় মাপ করিস্ বোন্!"

ইন্দিরা প্রীতিভরা স্বরে নমিতার হাত দুখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "অমন ক'রে দূর ক'রে দিলে, কিন্তু আমি বড়ই ব্যথা পাব। এমনি ক'রে মাঝে মাঝে এসো দিদি, তোমার ছোঁয়াচ পেয়েও যদি সোণা হয়ে যেতে পারি।"

এই মেয়েটীর অন্তরে কি বেদনা, নমিতা কোনক্রমেই তাহা বুঝিতে পারিল না। সে হাসির ছটায় সমস্ত ঘরকে আলোকিত করিয়া বলিল, "পরশমণি আমার কাছে নেই বোন্, কিন্তু যে পরশমণি পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাকে হেলা ক'রে নিজেকে রিক্ত করো না। বসন্তের দক্ষিণ পবন চিরদিন বয় না, আর সুবাতাস চ'লে গেলে আর ফেরে না।"

দম্পতীর মধ্যে কোথাও হয় ত কোনও বিরোধের কাঁটা আছে। নমিতা সযত্নে সেই কাঁটা তুলিবার চেষ্টা করিয়া, আত্মপ্রসাদ লইয়া ঘরে ফিরিল। নমিতা চলিয়া গেলে ইন্দিরা পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

জীবনের আনন্দ-দূত শুভক্ষণে বারে বারে আসা-যাওয়া করিবে, কিন্তু

সে-ই একাকী বিচ্ছেদের বেদনায় মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিবে। বিধবা নমিতা যে দৃঢ় বিশ্বাসে মাতৃত্বের মাধুর্য্য বর্ণনা করিতেছিল, ইন্দিরার অন্তরে তাহা সঞ্চারিত হইয়া উঠিল।

আনন্দ-মুখর একটী নন্দ-দুলাল তাহার কোল আলো করিবে। এ কি গভীর পরিতৃপ্তি! এ কি গভীর শান্তি! কিন্তু? কর্দ্দম ও দেবহুতির শ্রুত-কাহিনী তাহার মনে পড়িল। যে সন্তান তাহার জগতের সম্মুখে আত্মপরিচয় দিতে গ্লানি বোধ করিবে, সে কি সে-সন্তানের জননী হইতে পারে?

না, সে কখনই হয় না। প্রেমময় স্বামীর এই স্নেহস্পর্শ দিনে দিনে তাহাকে লুব্ধ করিতেছে। বহুদিন সে আত্মসংবরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু দ্বিচারিণী সে, পুত্রের জন্মকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে।

ভাবিতে ভাবিতে সে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া ফেলিল। স্নেহের নাগপাশ খুলিয়া তাহাকে বাহির হইতে হইবে। মৃত্যুর মধুর আলিঙ্গন তাহার জন্য, পতির স্নেহ-সম্ভাষণ নয়। তাহার জন্য বাসর-সজ্জা নয়, তাহার জন্য চিতাশয্যা।

ঘরে ফিরিয়া সে যোগেশের আঁকা ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়াছে, তবু সে সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল না। অন্ধকারের মধ্যে মনে হইল, যেন ছবির মৎস্যকন্যাগুলি জীবন্তরূপ ধরিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে।

এ আহ্বান তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। সুদূরচারিণী এদের পদশব্দ যেন নীরব কক্ষে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তাহারা যেন হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। অজগর যেমন করিয়া আপন শিকারকে

টানিয়া লয়, এ যেন তেমনি ডাক, তেমনই অপ্রতিহত শক্তি, তেমনই অনতিক্রমনীয়।

৩৩

ইন্দিরার অনুরোধে সত্যব্রত জল-যাত্রায় বাহির হইল।

সত্যব্রত অনুভব করিত, ইন্দিরা এখন কলিকাতার কলকোলাহলের মাঝে স্বস্তি পাইতেছে না। পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে সে যেন এড়াইয়া চলিতেছে।

যাহার গৃহ এতদিন কেবল মানুষের গুঞ্জনে মুখর ছিল, আজ এ সুগভীর নীরবতা নিশ্চয়ই তাহার পক্ষে গভীর পীড়াদায়ক ছিল। অথচ ইহার বদলে সে স্বামীর সঙ্গকে একান্ত করিয়া অবলম্বন করিতে পারে নাই।

ইন্দিরার প্রস্তাবে তাই সত্যব্রত যেন এক মুক্তির বার্ত্তা পাইল। সে সানন্দে সম্মতি জানাইল। ছোট একখানি ষ্টীমার ভাড়া করিয়া উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

প্রকৃতির উদার পরিবেশের মাঝে, স্বামী ও স্ত্রী হয় ত আপনাদের অবরুদ্ধ প্রেমকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিয়া জাগ্রত হইবে, এই ভরসায় সত্যব্রতের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ইন্দিরা যেন পরিচিত মানুষের মাঝে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। তাহার বন্ধু-গোষ্ঠীর উৎসব-সমারোহের মধ্যে সে যেন আর যোগ দিতে পারে না, অথচ নিজের শূন্য গৃহস্থালীকে প্রেমের বৈচিত্র্যে বর্ণোজ্জ্বল করিতেও পারে না।

যাওয়ার পূর্ব্বদিন নমিতা বিদায় অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছিল। নানা কথাবার্ত্তার পর বিদায়-কালে বলিল, "আমি হয়ত ভুল বুঝে, তোমায় মনস্তাপ দিয়েছি বোন্, কিন্তু জীবনের কোন মুহূর্ত্তই যেন মিথ্যা এসে অমৃত-ধারার প্রস্রবণকে রুদ্ধ না ক'রে দেয়। আশীর্ব্বাদ করি—রাগ ক'র না বোন্, বংসে কিছু বড় আছি, এই একান্ত নিরিবিলি মিলনের মাঝে পরশমণি যেন খুঁজে পাও।"

ইন্দিরা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে উত্তর দিয়াছিল—"আশীর্ব্বাদ সফল হোক্ দিদি! যত বড় লোভই হোক্ না কেন, সত্যের জয়মাল্যকে যেন গলায় তুলে নিতে পারি।"

নমিতা একথার ভিতরের ইঙ্গিত কিছুই বুঝিল না। ইন্দিরার অন্তরের দুর্জ্জেয় বেদনা, নির্ব্বাক্ মর্ম্মপীড়ার জ্বালা, সে কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিল না। প্রচ্ছন্ন রহস্যের কিছু আভাস ছিল, কিন্তু অবাঞ্ছিতের আবির্ভাবকে মনের কোণে স্থান না দিয়া, সে তৃপ্তির সহিত কহিল, "সে ভয় নেই বোন্, যতই দূরে রবে, ততই দূর হয়ে যাবে, শুধু চাইলেই অজস্রধারে সে এসে দেখা দেবে।"

গঙ্গার উজান বাহিয়া তাহারা চলিল। চারিদিকে জনপদ-প্রান্তরে, প্রকৃতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপ বদল করিয়া মায়া বুলায়। রবির অয়ন-পথে দিবসের রথচক্র থামিয়া বর্ণ, গন্ধ ও রূপের স্বর্গ গড়িয়া তুলে।

তাহার মাঝ দিয়া ষ্টীমার চলে। স্বামী ও স্ত্রী—একান্ত নিবিড় সঙ্গ-সুখের মাঝে—স্বামী ও স্ত্রী।

অথচ ব্যবধান। দিনের আলো ঘোলাটে হইয়া আসে, রাত্রির

পদধ্বনি বাজে, পল্লীর ঘাট পল্লীবধূর কঙ্কণ-ঝঙ্কারে মুখর হইয়া ওঠে। ইন্দিরা বিস্মিত-নত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহে।

'ডেকে' বসিয়া বসিয়া উভয়ে খোসগল্প করে। নৌকা পাল তুলিয়া বহিয়া চলে। যেন লঘুপক্ষ বলাকার সারি শস্যপূর্ণ মাঠে উড়িয়া যাইতেছে। রাত্রির অন্ধকার জাগে। দূরে কোথায় দীপ জ্বলে। দূরাগত সেই আলোক-রেখা যেন জগতের আদিম দিনের প্রথমোদ্দীপ্ত জ্যোতিঃশিখার মতই অপূর্ব্ব ও সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

তরুরেখা দিগন্তের সীমানায়, মরকতমণির মত সমুজ্জ্বল প্রভায় বর্ষার আনত মেঘের পাশে হাসে।

আষাঢ় মাস।

মেঘের বিচিত্র বিভিন্ন বর্ণ-সমাহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তোলে। কোথাও নীলোৎপলের ন্যায় কান্তিভরা জলদজাল, কোথাও দলিত কজ্জলরাশির মত মসীবর্ণ মেঘমালা। ধারায় ধারায় বর্ষা নামে, থামে, আবার আসে।

আকাশে কালো কালো চাতকেরা মেঘবারি পান করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছিল। সত্যব্রত তাহাদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "দেখ্‌ছ, কেমন চাতকেরা খেলা কর্‌ছে?"

ইন্দিরা উৎফুল্ল হৃদয়ে তাহাদের কৌতুক-ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। পরে বলিল, "ওদের মত যদি হওয়া যেত, কি মজাই না পাওয়া যেত।"

সত্যব্রত কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করে, "কেন? পৃথিবীর সেরা সৃষ্টি মানুষ। মানুষ হয়েছ ব'লে তোমার দুঃখ হয়?"

"না, একথা ব'ল্‌লে বিধাতার অপমান করা হবে। কিন্তু আজ শ্যামা

বনস্থলীর পাশে, চাতকের এই নৃত্য দেখে, আমার মন মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্ছে। পাখীর মত অমনি যদি উড়ে যেতে পারতাম, দূরে দূরে অজানা শূন্যে!......"

ইন্দিরা কথা শেষ না করিয়া গঙ্গার তীরে চাহিয়া রহে। ধানের ক্ষেতে সবুজ রঙের পিচ্‌কারী কে যেন ঢালিয়া দিয়াছে। তাহার পাশেই একটী বিকশিত-কুসুম কদম্বতরু পুষ্পের ঐশ্বর্য্যে হাস্য করিতেছে। ইন্দিরা বলিল, "দেখ্‌ছ, কেমন সুন্দর?"

কয়েকদিন এমন করিয়া কাটিয়া যায়। নিরুদ্দেশ যাত্রার মত তাহাদের জলযান জলরাশি বাহিয়া চলে। ভাগীরথী বাহিয়া অবশেষে পদ্মার মাঝে পৌঁছিল।

বর্ষাকালের ধারাসার শেষে সেদিন হঠাৎ চন্দ্রমা আপন জ্যোতি মেলিয়া ধরিল। ধনু রাশি ছাড়িয়া সেদিন চন্দ্র মকর রাশিতে প্রবেশ ক রয়াছে।

সত্যব্রত পত্নীকে রাশিচক্র বুঝাইয়া দিতেছিল। ইন্দিরা পুলকিত নেত্রে আকাশের বুকে জ্যোতিঃদীপমালার এই সমস্ত সুনিপুণ বিন্যাস দেখিতেছিল। তাহার বিস্মিত মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

পাগল বাদল বাতাস, পাশে কোথায় বনস্থলীতে যূথিকা ফুটিয়াছিল, আকুল উতলা সমীরণ তাহার সুবাস বহিয়া আনিতেছিল। মাদকতায় সত্যব্রত বিহ্বল হইয়া ওঠে। আকুল আগ্রহে পত্নীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরে। তাহার পর চুম্বনে সেই সুন্দর মুখখানি ভরাইয়া দেয়। পরে ধীরে ধীরে বলে, "আজ আমার চুক্তি ভাঙ্‌তে দাও, কি বল রাণু?"

ইন্দিরা তাহার নিষ্ঠুর ভাগ্যের প্রতি ক্রোধ করে। যৌবনের যে

স্বাভাবিক আকর্ষণ নর ও নারীর মাঝে মায়াপুরীর ইন্দ্রজাল গড়িয়া তোলে, তাহার এই মদির আহ্বান তাহাকে বিচলিত না করিয়া পারে না। অথচ সে সাড়া যেন পরিপূর্ণ হয় না। "রাজি নও ইন্দিরা? উপরে ঐ স্তব্ধ মেঘল আকাশ, তার মাঝে চাঁদ ও তারার মেলা। চারি পাশের এই নীরব বনভূমি, ফুলের গন্ধ, এও কি তোমার মনে সাড়া দিচ্ছে না? লজ্জা ক'রো না, ইন্দিরা! আপনাকে আমি আর থামিয়ে রাখ্‌তে পারি না।" জীবনের এই পরম মুহূর্ত্তে অভিমান ও মোহ ইন্দিরাকে নীরব করিয়া রাখিল। তাহার সমস্ত অঙ্গ যেন বলিতেছিল, "ওগো আমায় নিঃশেষ ক'রে নাও, আমায় পরিপূর্ণ ক'রে আস্বাদ করো।" কিন্তু কণ্ঠে কথা জুটিল না। দুরতিক্রম্য এক অভিশাপ উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল।

দুঃখে ও ক্ষোভে সত্যব্রত বলিল, "বেশ, আমি কি এতই হেয়? তোমার মনে কি একটুও মায়া-দয়া নেই, পাষাণি?"

ইন্দিরার সংযম ও সঙ্কল্প টিকিতে চাহে না। সে ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাসে ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি, আমার উপর রাগ ক'রো না। আমায় আর একটু সময় দাও।"

সত্যব্রত উত্তর দিল না। অভিমানে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে গর্জ্জিতে লাগিল। সে পুরুষ, দু'হাতে সবলে পৃথিবীকে জয় করাই তাহার বৃত্তি। এমন করিয়া মিনতি করা, তাহার পক্ষে অশোভন ও লজ্জাজনক। সে মনে মনে সংকল্প করিল, আর কখনও সে এরূপ করিবে না। কক্ষ হইতে জানালার ঝিলিমিলির ফাঁকে দেখিল, ইন্দিরা নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিয়াছে। চাঁদের আলো তাহার মুখের

একপাশে লাগিয়াছিল। সেই আলো-ছায়ায় তাহার ব্যথামৌন মুখখানি দেখিয়া সত্যব্রতের মনে অনুকম্পা জাগিল। কিন্তু যাই যাই করিয়াও যাওয়া হইল না। লাঞ্ছনার তীব্রতায়, একটী নিবিড় বিতৃষ্ণা তাহার সমস্ত মনকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিল। লজ্জায় ও ক্ষোভে ইন্দিরা বিধাতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। হায় নিষ্ঠুর, তুমি কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলে? একাগ্র বাসনা তাহার চিত্তকে পলে পলে যাহার অভিমুখে টানিতেছিল, সেই প্রিয়তমের কাছে সে আপনাকে নিবেদন করিতে পারিবে না। দষ্ট ও ভ্রষ্ট কুসুমের মত দেবতার পূজায় তাহার স্থান নাই।

নমিতার কথাগুলি তাহার মনে পড়িতেছিল। মায়ের সম্মান সকলের চেয়ে বড় সম্মান। মহত্তর যে প্রগতির পথে জগৎ চলিয়াছে, সে পথের পথিকদল ত মায়েরই দান। মানুষের সংস্কৃতির পতাকা যাহারা বহে, মায়ের শিশু তারা। সেই দেববাঞ্ছিত মাতৃপদ তাহার জন্য নহে। মেঘের ফাঁকে চাঁদ ডুবিয়া যায়। অন্ধতমসায় পৃথিবী ঢাকা পড়ে।

ইন্দিরার কাণের পাশে মৎস্যকন্যাদের আবাহন-সঙ্গীত যেন বাজিয়া উঠে। তাহার চারিপাশে কাহারা যেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে। তড়িৎরেখার স্পর্শের মত এক অজ্ঞাত চমকে তাহার সমস্ত দেহ-মন শিহরিয়া উঠে। চাঁদের আলো, মেঘের ফাঁকে বাহির হইয়া পড়ে। ইন্দিরা উঠিয়া নিজের কক্ষে যায়।

ইন্দিরার শান্ত-সংযত প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যে অনন্ত অক্ষয় বেদনা ছিল, সত্যব্রত ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারিল না। অভিমানের দুর্জ্জয়বেগে অভিভূত হইয়া রহিল।

ইন্দিরা ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। ঘুম আসে না। চোখের সম্মুখে যোগেশের আঁকা ছবিখানি ভাসিয়া যায়। ইন্দিরা শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, সে ত সতী-সাবিত্রী নয়। তাহার কলঙ্কিত দেহ লইয়া যদি স্বামীর তৃপ্তি হয়, তবে সে কেন বাধা দেয়? আর কতকালই বা এমন করিয়া দিন কাটিবে?

যৌবনের যে বুভুক্ষু ক্ষুধা সত্যব্রতের মনে হানা দিয়াছে, তাহাকে সে কেমন করিয়া থামাইবে? তাহার সম্মুখে দুই পথ খোলা রহিয়াছে, এক আত্মবিসর্জ্জনের পথ, অপর ভোগ-লালসার সহজ সরল পথ।

নমিতার কথাগুলি তাহার মনে বিপ্লব তুলিল। সত্যকে পাওয়ার চেয়ে বড় জিনিব আর নেই। অশুচি দেহ লইয়া, সংশয়িত মত নিয়া, সে কখনও সত্যব্রতের শ্রেয়সী প্রেয়সী হইতে পারিবে না। কাজেই মৃত্যুর পথ তার পথ।

সকালবেলায় জাহাজের খালাসীরা বলিতেছিল, তাহারা যে স্থানে নোঙ্গর করিয়াছে, লোকে তাহাকে 'আঁধার-মাণিক' বলে। 'আঁধার-মাণিকে'র দুস্তর ঘূর্ণাবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণী ডুবিয়া মরিয়াছে। ইন্দিরার মনে হইল, তাহাদের মৃত আত্মারা যেন নীল জলের গভীরতম তমিস্রা হইতে মুখ তুলিয়া ডাকিতেছে।

সে উঠিয়া বসিল। বাতিদানে বাতি জ্বালিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। নির্জ্জন নিঃশব্দ নিশীথ রাত্রির নীরবতা ভাঙ্গিয়া, নদীর বালুচরে এক একটী পাখী মাঝে মাঝে শব্দ করিয়া উঠিতেছে, আবার চারিদিক নিঝুম হইয়া যাইতেছে। সেই নীরবতার মাঝে জলস্রোতের গতি-হিল্লোল অতি অস্ফুট রবে শোনা যাইতেছে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইন্দিরা লিখিল—সে যেন চিঠি নয়, হৃদয়-ঝরা ব্যথা যেন আপন অপরিমিত নিরাশার মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল।

ইন্দিরার চিঠি এইরূপ—

"প্রিয়তম! বিদায়! তোমার জীবনে ধূমকেতুর মত অভিশাপের বোঝা নিয়ে উঠে, আজ বিস্মৃতির অতল তলায় ডুবে গেলাম। জীবনের চলছন্দের সুর আমার জীবনে বিফল হয়ে গেছে, তাই তোমায় আর আমার মিলনে রুদ্রের এই নিষ্ঠুর পরিহাসই জড়িত রয়ে গেল, অমৃতের অমৃতধারা ফুটে উঠল না। কতবার ভেবেছি, তোমার অপরিমিত প্রেমের মাঝে আমি নূতন জন্ম লাভ করি, মুক্তিস্নান করি, কিন্তু মনের দুর্ব্বলতায় কিছুতেই পেরে উঠলাম না।

তুমি আমার জীবনের ধ্রুব-শতদল, আজ মরণের বেলাভূমে দাঁড়িয়ে তোমার ভালবাসার ঋণ স্মরণ ক'রে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমায় অপমান ক'রতে চাইনে, শুধু বিহ্বল অন্তরে বলি, এ জন্মে যা পাওয়ার যোগ্য হইনি, পরজন্মে তা যেন পাই। তোমায় ভালবেসেছিলাম, একান্ত প্রাণ-মন দিয়েই ভালবেসেছিলাম, কিন্তু পঙ্কে আমার জন্ম, তাই সে ভালবাসাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ ক'রতে পারলুম না।

তুমি ভাবছ, একি হেঁয়ালি বল্‌ছি। হেঁয়ালি নয় স্বামিন্, আমার জন্ম প্রেমের প্রশস্ত রাজবর্ত্মে নয়। যে প্রেম লজ্জার

আড়াল খোঁজে, সেই প্রেম আমার জনয়িত্রী। পিতার জীবনের গোপন-লজ্জার কাহিনী আজ প্রকাশ ক'রে লাভ নেই। তবে এইটুকু জানালে চল্‌বে, তাঁর এক রাজপুতানী বিধবা ছাত্রীর গর্ভে আমার জন্ম হয়।

তোমার উদারতা আমি জানি। তুমি প্রসন্নচিত্তে হয়ত এই পঙ্কতিলক-আঁকা ভালে, তোমার দক্ষিণ হস্তেই প্রণয়ের সিন্দুর-রেখা চর্চ্চিত করতে চাইতে, কিন্তু এইটুকু হ'লে হয়ত আমিও তোমার প্রাণঢালা ভালবাসায় অবগাহন ক'রে শুদ্ধ হয়ে উঠ্‌তে পারতুম।

কিন্তু জন্মতিথির জল-যাত্রা জীবনের শনিগ্রহ হয়ে উঠ্‌ল। যোগেশ দা'র দোষ দেই না। নিশীথরাত্রিতে সুন্দরী তরুণীর সঙ্গ হয়ত তাহাকে পাগল ক'রেছিল, কিন্তু আমি বাধা দেই নি। আজ আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, সেদিন এমন স্মৃতিবিভ্রম আমার কেন হয়েছিল, এমন মোহ আমায় কেন চেপে বসেছিল।

আমাদের চারিপাশে রিরংসার যে আব্‌হাওয়া বইত, অসংযমের যে পরিবেশ ছিল, হয়ত আমার অধঃপতনের মূল সেখানে খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি যে নিজে দোষী নই, একথা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও গলা উঁচু ক'রে ব'ল্‌তে পারি নে।

সেই দুর্দ্দিনের দূরতিক্রম্য গ্লানি আমার মনকে ক্লিষ্ট ক'রে তুলেছে। এ পঙ্ককে কিছুতেই আমি ভুল্‌তে পার্‌ছিনে। আমার শিক্ষা ও দীক্ষার মাঝে যে নূতনত্ব ছিল, মনে করেছিলুম, তাই দিয়ে তোমায় আপন ক'রে নিতে পারবো। ভেবেছিলুম দু'জনে আমরা আনন্দের নীড় রচনা ক'র্‌তে পারবো। কিন্তু সে হ'ল না।

নমিতার সহিত পরিচয় আমার জীবনে সত্যের দীপ জ্বেলে দিয়েছে। এই মেয়েটী, ভারতবর্ষের যে নিজস্ব সুর ভুল্‌তে বসেছিলুম, তাই জাগিয়ে দিয়েছে। নর ও নারীর মিলন ত শুধু লালসার পূজা নয়। ভোগের বিনিময় নয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলে কল্যাণের বেদী স্থাপন ক'রে তাদের সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা ক'রবে। তাদের সাধনা বিশ্বকে নূতন দীপ্তিতে ভাস্বর ও গরিমাময় ক'রে তুল্‌বে।

ভারতবর্ষের সেই নিজস্ব বাণী, সেই সংযম ও ধ্যানের বাণী যতই অনুভব ক'র্‌লুম, ততই বুঝ্‌লুম, মাতৃত্বের গৌরব আমার জন্যে নয়। বাগানের মালি সুপুষ্ট ফল কিম্বা সুবৃহৎ পুষ্প প্রস্তুত করবার জন্য কত আয়াস ক'রে চলেছে। জগতের সভ্যতা যারা চালাবে, তাদের জন্মের জন্য তার চেয়ে বিশেষ ও বিরাট সাধনা চাই।

আমার এ অশুচি দেহ-মন নিয়ে, জীবনের পথে চলা আমার

দায় হয়ে উঠেছে। তোমায় পেয়েও তাই পেলুম না। না পাওয়ার এই বেদনা নিয়ে ম'র্তে চাই। তাহ'লে হয় ত আবার তোমায় পাবো।

আকাশের চাঁদ এখনও আলো ঢালছে। এই আলোর পাশে আমার কালো মুখ নিয়ে কিছুতেই আমি দাঁড়াতে পার্ছি না। ক্ষোভে ও বেদনায় আমি মুহ্যমান হয়ে পড়্ছি।

আমি চ'লে গেলে আমার এই দুঃসহ ব্যথা স্মরণ ক'রে এই হতভাগিনীর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলো। আর যদি বেঁচে থাকো, তবে দেশের কল্যাণের জন্য ত্যাগ ও সংযমের বাণী প্রচার করো।

পশ্চিমের যে ঘরভাঙা সুর আমাদের জীবনে আস্ছে, এ কখনও আমাদের ধাতে সইবে না, আমাদের ঋষিরা ত্যাগ ও মুমুক্ষত্বের যে পথ এঁকে দিয়েছেন, সে পথই জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ। আজ মরণের দিনে দাঁড়িয়ে আমি সেই কথাই বার বার অনুভব ক'র্ছি। যে গভীর বিশ্বাসে নমিতা গীতাকে আশ্রয় ক'রেছে, সেই বিশ্বাস, সেই আনুরক্তি যদি আমার থাক্তো, তাহ'লে হয়ত আমার জীবন এমন মরুময় হয়ে উঠ্তো না।

অনেক লিখেছি। আর বেশী লিখে তোমায় বিরক্ত করবো না। এ হতভাগিনীর জন্য তুমি শোক ক'রো না। আমায় যদি তুমি ভালবেসে থাক, তাহ'লে আমার অনুরোধ,

বিপথগামী আমাদের দেশের উচ্ছৃঙ্খল মনকে তুমি ঘরের মাধুর্য্য ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে ফিরিয়ে এনো। আমার প্রাণভরা ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার জন্মজন্মান্তরের ইন্দিরা"

চিঠি লেখা শেষ করিয়া ইন্দিরা সেখানি একখানি রঙীন খামে পুরিয়া, সহসা চোখে পড়ে এমন স্থানে রাখিল। পরে ফুলদানি হইতে ফুল লইয়া চিঠিখানি সাজাইয়া রাখিল। তাহার পর নিঃশব্দ পদক্ষেপে সত্যব্রতের কক্ষে গেল। সত্যব্রত অঘোরে ঘুমাইতেছে। ইন্দিরা আলো জ্বালিল না। খোলা দ্বার-পথে খানিকটা চাঁদের আলো সত্যব্রতের প্রশস্ত-ললাটে পড়িয়াছিল। সেই সুন্দর মুখের পানে অনেকক্ষণ সে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ভূনত হইয়া সত্যব্রতকে প্রণতি জানাইয়া, তাহার পদস্পর্শ করিল।

সত্যব্রত তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন নন্দনের পারিজাত-কাননে সে ইন্দিরার মিলন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

নিঃশব্দচারিণী অভিসারিকা নীরবে চলিয়া গেল। তাহার কতখানি যে সে পিছনে রাখিয়া গেল, একমাত্র অন্তর্যামীই তাহা জানেন। ধীরে ধীরে সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীরব রাত্রি। নক্ষত্রের রাশি দীপ্ত-সমুজ্জ্বল। নদী-জলে স্বর্ণদ্যুতি ঝলক দিতেছিল। চারিদিকে এত প্রশান্তি, তথাপি যাইতে হইবে। ইন্দিরার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল ফিরিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণে

দৃঢ়-সংকল্প লইয়া সে সজল-চক্ষে নিষ্ঠুর ভাগ্যের উদ্দেশ্যে করযোড়ে নমস্কার জানাইল। পরে 'আঁধার-মাণিকে'র খরস্রোতে লাফ দিয়া পড়িল।

বিশ্ব-প্রকৃতি এই নিষ্ঠুর অভিনয় দেখিয়া এতটুকু চঞ্চল হইল না। চাঁদ তাহার জ্যোৎস্নালাবণ্য ইন্দিরার আলুলায়িত কুন্তলে ঢালিয়া দিতে লাগিল। সত্যব্রত তাহার স্বপ্ন অভিসারে অনবশেষ প্রতীক্ষায় রহিল।

কেহ কিছু জানিল না। 'আঁধার-মাণিকে'র কালো জল একটি মাণিক বুকে করিয়া কলহাস্যে বহিয়া চলিল।

সমাপ্ত।